উৎসর্গ।

রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

রাজন্!

আপনার শীলতা ও শিষ্টাচারে পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই পরিতুষ্ট। সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াও এরূপ সর্ব্বজন-প্রিয় হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না, ইহাই আপনার নবীন জীবনের সর্ব্বপ্রধান অলঙ্কার। ইহার উপর দরিদ্রে দয়া, বন্ধুজনে প্রীতি, এবং সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানে অনুরাগের ক্রমবিকাশে আপনার ভবিষ্যৎ জীবন জনসমাজের অশেষ কল্যাণের আকর হইবে বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই আপনি আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জনেরও পরম আদরের পাত্র। বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে যাঁহার জীবন-কাহিনী বিবৃত হইলে সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য সম্পাদনের পথ প্রদর্শক। আপনি সেই উপেক্ষিত বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুরাগী ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অগ্রসর, তাই বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবন সমাদরে আপনার করে অর্পণ করিলাম। ইহার প্রতি প্রীতি-প্রফুল্ল নয়নে দৃষ্টিপাত করিলে চরিতার্থ হইব।

বিনয়াবনত

গ্রন্থকার

ভূমিকা।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিস্তৃত জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াও আমার মনের খেদ মিটে নাই। সেই অনন্যসাধারণ গুণসম্পন্ন মহাপুরুষের বাল্যজীবন ও ছাত্রাবস্থা যেরূপ উপদেশপ্রদ এবং যেরূপ বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, স্বদেশ বিদেশে সেরূপ বহুবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ জীবনযাত্রা বিরল বলিয়াই আমার বিশ্বাস। তাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয় চরিত সুকুমারমতি বঙ্গীয় বালকগণের পাঠোপযোগী করিয়া প্রকাশ করিলাম। যাঁহার চরিত-কাহিনীর বর্ণনায় অনেক সময়েই নিজে নিজে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছি এবং কত সময়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি, "চরিতাবলীর" রচয়িতার শোভা ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ সেই জীবনীপুষ্প স্বদেশীয় বালক বালিকাগণের প্রীতিবর্দ্ধন ও উপদেশ লাভার্থে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইল। ভরসা করি বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ গ্রন্থখানির প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবেন। মূল্যের আধিক্যে গ্রন্থপ্র বিশেষ ব্যাঘাত হয়, এই বিবেচনায় ইহার মূল্য যতদূ ।৩৮ আ০ করা হইল।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। কথিত আছে যে, উদয়গঞ্জ নিবাসী জ্যোতিষী ভবানন্দ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই আসন্নপ্রসবা বধূর কোষ্ঠী গণনা কবিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, যে বধূমাতাব কোন প্রকার পীড়া হয় নাই। তিনি সুস্থ শরীরে নিরাপদে কালাতিপাত কবিতেছেন। ঈশ্বরানুগৃহীত কোন মহাপুরুষ ইহাঁর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিযাছেন, তাঁহারই তেজঃপ্রভাবে প্রসূতি অধীবা হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ বিশিষ্টরূপ শক্তিশালী শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র প্রসূতি সুস্থ হইবেন। যখন সকলেই দেখিলেন, শিরোমণি মহাশযের কথাই সত্য হইল, তখন কথিত মহাপুরুষের সমাগমও কিয়ৎ পরিমাণে লোকেব মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিল। এই স্থানে আবও একটী ঘটনাব উল্লেখ আবশ্যক, ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ ধর্ম্মপবায়ণ যোগী ছিলেন। যৌবনের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ কবিয়া দীর্ঘ কাল নানা তীর্থ পর্য্যটন করেন। শেষে পুত্র কলত্র লইয়া জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিবার মানসে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র, সিদ্ধপুরুষ রামজয় তর্কভূষণ, শিশুর জিহ্বার তলে আল্‌তায় কিছু লিখিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন ঃ—এ শিশু উত্তর কালে সকলকে পরাজয় করিবে, ইহার প্রতিজ্ঞার পরাক্রমে চারিদিক কম্পিত হইবে, যাহা ধরিবে তাহাই

করিবে, কাহাকেও ভয় করিবে না,এই বালক পরম দয়ালু হইবে, ইহার দয়া দাক্ষিণ্যে সকলেই মুগ্ধ হইবে, আর ইহার যশোগীতে চারিদিক পূর্ণ হইবে, ইহার জন্মগ্রহণে আমার বংশের অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ হইল ; এইজন্য ইহার নাম রাখিলাম "ঈশ্বরচন্দ্র"। আমিই ইহার দীক্ষাগুরু হইলাম, এ বালক আর অন্য গুরু গ্রহণ করিবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতামহ কর্ত্তৃক সূতিকা-গৃহে যে নামে অভিহিত হইয়াছিলেনসেই, "ঈশ্বর-চন্দ্র" নামেই উত্তরকালে জনসমাজে পরিচিত হইয়াছেন, আব নূতন নামকরণ হয় নাই।

ঈশ্বরচন্দ্রেব জন্মস্থান বীবসিংহ গ্রাম, কিন্তু উহা তাঁহাব পৈত্রিক বাসভূমি নহে। হুগলী জেলায় বনমালী-পুব নামে একখানি গ্রাম আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রপিতামহ ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয ঐ গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার লোকান্তর গমনে তদীয় পঞ্চপুত্র বনমালীপুরেব পৈতৃক ভবনে বাস কবেন। ভ্রাতৃগণের তৃতীয় রামজয় অন্যান্য সহোদরদিগের আচরণে মর্ম্মাহত হইয়া সংসার-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া নিরুদ্দেশ হন। কাহাকেও না জানাইয়া, যখন রামজয় তর্ক-ভূষণ গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন পুত্রকন্যাসহ পত্নী দুর্গাদেবীকে বনমালীপুরের পৈতৃক বাসভবনেই রাখিয়া যান।

বীরসিংহে উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত বাস করিতেন, তিনি ব্যাকরণে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রামজয় গৃহত্যাগের সময় যে পত্নী দুর্গাদেবীকে সন্তানসহ বনমালীপুরে রাখিয়া যান, তিনি বীরসিংহবাসী ঐ উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের কন্যা। দুর্গাদেবী কিছুকাল অতি কষ্টে শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া অবশেষে অসহনীয় যন্ত্রণায় বিপর্য্যস্ত হইয়া বীরসিংহে পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। দুর্গাদেবীর দুই পুত্র ও চারি কন্যা। ইঁহাদের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ে[illegible] যাত্রী কাম।

দুর্গাদেবী পুত্রকন্যাসহ পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলে পর, তাঁহার পিতা তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় বহু সমাদরে কন্যা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী গুলিকে গ্রহণ করিযা পরম যত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। অল্প কয়েকদিনের জন্য দুর্গাদেবীর মনে এই আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, পুত্রকন্যাসহ তিনি কিছুকাল কথঞ্চিৎ নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে পারিবেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহার সে আশা অনতিকাল মধ্যে বিলুপ্ত হইল। একে স্বামী নিরুদ্দেশ, তাহাতে কয়েকটী অপোগণ্ড বালকবালিকার ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার উপর, পিত্রালয়ে পিতা-

মাতার অত্যধিক বার্দ্ধক্যনিবন্ধন তদীয় পুত্র ও পুত্র-বধূর উপর সংসারের সমস্ত ভার ন্যস্ত হওয়ায় দুর্গা-দেবীর দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগের সীমা রহিল না। তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এইরূপ সাতজন লোকের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিতে কিছুতেই সম্মত ছিলেন না। সেই কারণে সর্ব্বদাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বনে নানাপ্রকার অপ্রীতিকর বচসা ও কলহের অবতারণা করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে অত্যধিক মর্ম্মপীড়ার কারণ উপস্থিত হইলে, কন্যা তাহা বৃদ্ধ পিতামাতার গোচর করিতেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয়ের [illegible], কারণ উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ও তদীয় পত্নী সম্পূর্ণরূপে পুত্র ও পুত্রবধূর অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন; কোন বিষয়ে কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব চলিত না। এজন্য কিছুদিনের মধ্যেই দুর্গাদেবী বুঝি-লেন যে, পুত্রকন্যাসহ পিত্রালয়ে পিতার অন্নে দেহ ধারণ করা দুরাশা মাত্র। অবশেষে পিতার আদেশে পিতৃ-গৃহের অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতেই বালকবালিকা সহ অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

সেকালে নিরুপায় ভদ্র পরিবারের অসহায়া স্ত্রীলো-কেরা টেকুয়া ও চরখায় সূতা কাটিয়া অন্যের সাহায্যে সেই সূতা বাজারে বিক্রয় করিয়া অতি দীনভাবে আপনা-

দের ভরণ-পোষণ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। দুর্গাদেবীও সেই পথ অবলম্বন করিলেন। তিনি একাকিনী হইলে হয়ত এই সামান্য উপায়ে অর্জ্জিত অর্থে কায়ক্লেশে তাঁহার দিনপাত করা সম্ভব হইত। এত গুলি সন্তান লইয়া এ উপায়ে কোন ক্রমেই অন্নসংস্থান হয় না, এজন্য পিতা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন। এইরূপে কিছুকাল অতি কষ্টে অতিবাহিত হইতে লাগিল। এমন সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাস জননীব অসহনীয় যন্ত্রণা দর্শনে নিবতিশয় কাতর হইয়া অর্থোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় বাল্যকালেই গৃহত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। জননীর অনুমতি লইয়া বালক ঠাকুরদাস অর্থোপার্জ্জনের জন্য যখন কলিকাতায় উপস্থিত হন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র। ঠাকুরদাসের অতিনিকট জ্ঞাতিপুত্র জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার সে সময়ে কলিকাতায প্রতিপন্ন ব্যক্তি হইয়াছিলেন। সুসময় ও সহৃদয়তা গুণে তিনি অকাতরে অন্নদান করিতেন। ঠাকুরদাস বিপন্ন হইয়া তাঁহার আশ্রয়-প্রার্থী হওয়ায় পরম সমাদরে গৃহীত হইলেন।

ঐ সময়ে মোটামুটি ইংরাজী জানিলে, সওদাগর সাহেবদের আফিসে সহজেই কর্ম্ম কাজ হইত, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে ইংরাজী শিক্ষা

করাই পরামর্শসিদ্ধ ভাবিয়া, সকলেই ঠাকুরদাসকে সেইরূপ পরামর্শ দিলেন। কিন্তু এখনকার মত সে সময়ে ইংরাজী শিক্ষাব তাদৃশ সুবিধা ছিল না। পড়িবার পুস্তক ছিল না, পড়াইবাব লোক ছিল না। তখন এখনকার মত পাড়ায় পাড়ায় বিদ্যালয়ও হয় নাই। সেকালে লোকে ইংরাজী কতকগুলি শব্দ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত। মনের ভাব ব্যক্ত করিবার সময় হযত দুই তিনটী বিশেষ্য পদ বা দুই তিনটী ক্রিযাপদ একত্র যোজন-কবিযা মনের ভাব ব্যক্ত কবিত। সাহেবেবা কোন প্রকারে তাহাব অর্থ বুঝিযা লইতেন। অনেকে অধিকাংশস্থলে [illegible]ভাব কতক ইংরাজী, কতক হিন্দি, আব অবশিষ্ট আভাস ইঙ্গিতে প্রকাশ করিত। এক-জন লোক খুব ভাল ইংরাজী শিখিযাছে বলিযা যখন প্রশংসা পত্র পাইত, তখন তাহার এই অর্থ বুঝিতে হইত যে, সে ব্যক্তি পাঁচশত, কি হাজার, কি দুই হাজাব শব্দ কণ্ঠস্থ করিয়াছে। এইরূপে সে সমযে সাধা-বণতঃ ইংরাজী বিদ্যার পরিসমাপ্তি হইত। ঠাকুরদাস এইরূপ ইংরাজী শিক্ষার আয়োজন করিলেন। ন্যায়া-লঙ্কার মহাশয়ের এক বন্ধু কাজ চালাইবার মত ইংরাজী জানিতেন, তিনিই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুবোধে ঠাকুর-দাসকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সেই ভদ্র-লোকটী বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে সমস্ত দিনই বাহিরে

থাকিতেন, সুতরাং সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় ঠাকুরদাসকে তিনি পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

ঠাকুরদাস সেই ভদ্রলোকের বাসায় গিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়া ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন। কিছুদিন অতীত হইলে পর, একদিন সন্ধ্যার সময় সেই ভদ্রলোক ঠাকুরদাসকে অত্যন্ত শীর্ণ ও দুর্ব্বল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরদাস তুমি এত রোগা হইতেছ কেন ?" ঠাকুবদাস কি উত্তর দিবেন কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইতে লাগিলেন। তখন সেই সদাশয় মহাশয়ের পীড়াপীড়িতে বলিলেন, "মহাশয়! ইংরাজী পড়ার সূচনা হইতে আমি একাহারে দিন যাপন করিতেছি। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে সন্ধ্যার পরেই উপরি লোকের আহারাদি শেষ হয়। আহাবের জন্য বিলম্ব করিলে পড়া হয় না, আবার পড়িতে আসিলে, বাত্রিতে গিয়া দেখি, সকলের আহার হইয়া গিয়াছে। অগত্যা রাত্রিতে আর আহারাদি হয় না। সেই জন্যই শরীর দিন দিন কৃশ হইয়া যাইতেছে"। ঐ সময়ে সেই শিক্ষকের এক দয়ালু আত্মীয় সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই শিক্ষালোলুপ বালকের ক্লেশের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন "দেখ ঠাকুরদাস! যাহা শুনিলাম, তাহাতে তোমার আর ওখানে থাকা হইতে পারে

না। যদি তুমি রাঁধিয়া খাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে আমার বাসায় স্থান দিতে পারি।" ঠাকুরদাস এই প্রস্তাবে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। এই ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি তাহার পর দিন হইতে তাঁহার বাসায় গিয়া রহিলেন এবং দুই বেলা আহারের সংস্থান হওয়াতে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত মনে লেখা পড়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দয়ালু ব্যক্তির যেরূপ সদাশয়তা ও সৌজন্য ছিল, অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল ছিল না। তাঁহাকে সর্ব্বদা অর্থাভাবে ক্লেশ পাইতে হইত, এজন্য ঠাকুবদাসকেও অনেক সময ক্ষুধায় ছট্‌ফট্ কবিতে হইত। তথাপি তিনি এই ব্যক্তির স্নেহ মমতা ও মিষ্ট কথায় সে ক্লেশ কথঞ্চিৎ সহ্য করিতে সক্ষম হইতেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত দুই বেলা দুই মুষ্টি খাইতে পাইয়া নিশ্চিন্ত মনে লেখা পড়া করিতে অবসর পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। এই ভদ্রলোকটি দালালীব কার্য্য করিতেন। সহসা ইঁহাব আয় এত হ্রাস হইল যে, দিন চলা ভাব হইল। তিনি সামান্য অর্থোপার্জ্জনের জন্য সমস্ত দিনই বাহিবে থাকিতেন, সন্ধ্যার সমযে কোন দিন কিছু আনিতেন, কোন দিন বা শূন্যহস্তে বাসায় ফিরিতেন। যেদিন কিছু আনিতেন,সেদিন সমস্ত দিনের পর রাত্রিতে দুই জনের আহার হইত, যেদিন কিছু পাইতেন না, সেদিন হয়ত উপবাসেই যাইত। এইরূপ আকস্মিক

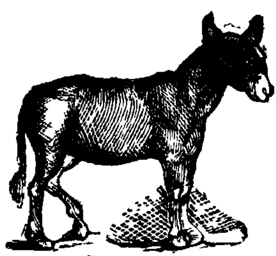
বিপৎপাতে ঠাকুরদাসের ক্লেশের সীমা পরিসীমা রহিল না। অনেক সময়ে সমস্ত দিন অনাহারে কাটাইতে হইত। ক্ষুধায় কাতর হইলে, কোথায় যাইবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেন না। তাঁহার একখানি সামান্য পিত্তলেব থালা আর একটী ছোট ঘটী ছিল, তিনি চিন্তা করিয়া স্থিব করিলেন যে, এক পয়সাব শালপাতা কিনিয়া রাখিলে দশ বার দিন তাহাতে আহার চলিতে পারে। থালা খানি বিক্রয় করিয়া যে পয়সা হইবে, তাহা দ্বারা .যেদিন, দিনেব বেলায় আহার না হইবে, সেইদিন এক পয়সাব কিছু কিনিয়া খাইলে চলিবে। এই ভাবিযা তিনি থালা খানি নূতন বাজারে কাঁসাবিদেব দোকানে বিক্রয় কবিতে গেলেন। একে একে সকল কাঁসাবিই বলিল, "আমরা অজানিত লোকের নিকট পুবাণ বাসন কিনিযা শেষে কি বিপদে পড়িব? সময়ে সময়ে পুরাণ বাসন লইয়া বড় ফ্যাঁসাতে পড়িতে হয়। আমবা তোমাব থালা লইতে পারিব না।" যখন কোন দোকানদারই থালা কিনিল না, তখন নিরুপায় হইযা বিষণ্ণ মনে বাসায ফিরিযা আসিলেন। ক্ষুধায় কাতর হইযা থালা বিক্রয় করিতে গিয়াছিলেন, শেষে সে দিনও উপবাসেব যন্ত্রণায কাটিয়া গেল।

আর একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে ক্ষুধাব জ্বালায আর গৃহে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। অন্যমনস্ক হইয়া ক্ষুধায়

জ্বালা ভুলিবার অভিপ্রায়ে তিনি রৌদ্রে পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি তাঁহার অভিপ্রায়ের বিপরীত ফলভোগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার আশ্রয়দাতার বড়বাজারের বাসা হইতে ঠন্‌ঠনিযা পর্য্যন্ত আসিবার পব তিনি চক্ষে সরিষা ফুল দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। এমন সময় তিনি এক দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই দোকানে একটী মধ্যবয়স্কা বিধবা স্ত্রীলোক মুড়ি মুড়কী বেচিতেছিল। বিধবা ঠাকুবদাসকে ঐরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিযা জিজ্ঞাসা কাবিল, "বাবা ঠাকুব দাঁড়াইয়া আছ কেন?" ঠাকুবদাস পানার্থে একটু জল চাহিলেন। বিধবা ঠাকুবদাসকে সস্নেহে ও সমাদরে বসিতে বলিযা জল আনিযা দিল এবং ব্রাহ্মণেব ছেলেকে সুধু জল দেওয়া অন্যায় বোধে কিছু মুড়কী ও জল দিল। ঠাকুব-দাস মুড়কী কয়টী যেরূপ ব্যগ্রভাবে ভক্ষণ কবিলেন, তাহা দেখিয়া বিধবা বুঝিতে পাবিল যে, তাঁহার সে দিন আহার হয় নাই, তখন সে স্ত্রীলোকটী বলিল "বাবাঠাকুর আজ বুঝি তোমাব খাওয়া হয় নাই?" ঠাকুরদাস বলি-লেন, "না মা, আজ এখনও আমি কিছুই খাই নাই।" স্ত্রীলোকটী বলিল, "বাবাঠাকুর জল খাইও না, একটু অপেক্ষা কর।" এই বলিযা নিকটবর্ত্তী গোয়ালার দোকান

হইতে দই কিনিয়া আনিল। মুড়কী ও দই দিয়া ঠাকুরদাসকে ফলার করাইল। আহার করাইয়া তাঁহার নিকট তাঁহার অবস্থার কথা শুনিল এবং বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া বলিয়া দিল, "দেখ যে দিন তোমার খাওয়া না হবে, সে দিন উপোস করিয়া থাকিও না। আমার এইখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইও।" বিধবা যে কেবল অনুরোধ করিয়াছিল, তাহা নহে, ঠাকুরদাসকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিল। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার স্বরচিত অসম্পূর্ণ শৈশব-চরিতের একস্থানে লিখিয়াছেন :—"পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই এরূপ দয়া প্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন না। যাহাহউক, যে যে দিন দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত, ঠাকুরদাস, সেই সেই দিন ঐ দয়াময়ীর আশ্বাসবাক্য অনুসারে তাঁহার দোকানে গিয়া, পেট ভরিয়া ফলার করিয়া আসিতেন।" যাঁহার বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন, যাঁহার দ্বারা সংসারের কল্যাণ সাধিত হইবার কথা, তাঁহাকে বিধাতা এইরূপ দুঃখ কষ্টের মধ্যেও রক্ষা করেন। যে ব্যক্তি এরূপ দুঃখদারিদ্র্যের পেষণে পিষ্ট

হইয়াও সৎপথে চলিতে প্রয়াস পান, বিধাতা তাঁহাকে সকল সুখের অধিকারী করিয়া নিজের মহিমা প্রকাশ করেন। ঠাকুরদাসও উত্তর কালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় পুত্র-রত্ন প্রাপ্ত হইয়া সংসারে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন।



দ্বিতীয় অধ্যায়।

যখন এইরূপ দুঃখ কষ্টে ঠাকুবদাসেব দিন কাটিতে লাগিল, তখন তিনি প্রাযই তাঁহাব আশ্রযদাতাকে বলিতেন, কোন সুযোগে আমাকে কোথায়ও একটু কর্ম্মকাজ করিযা দিন। আমি ধর্ম্মপ্রমাণ বলিতেছি, প্রাণপণ কবিয়া প্রভুব কার্য্য করিব, প্রাণান্তেও অধর্ম্মাচরণ করিব না। আমার উপকাব করিয়া আপনাকে কখন কোন কথা শুনিতে বা লজ্জিত হইতে হইবে না। দেখুন, আমার মা ও ভাইবোনের কথা যখন মনে হয়, তখন আব মুহূর্ত্তেব জন্য জীবন ধাবণ কবিতে ইচ্ছা হয না। যখন ঠাকুরদাস আর্ত্তভাবে এই সকল দুঃখের কথা বলিতেন, তখন চক্ষেব জলে তাঁহাব বক্ষ ভাসিয়া যাইত। তাঁহার কাতরতা দর্শনে আশ্রয়দাতার হৃদযে বিশেষ দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি মাসিক দুই টাকা বেতনে ঠাকুরদাসকে

একস্থলে কর্ম্ম করিয়া দিলেন। এই দুই টাকা বেতনের কর্ম্ম পাইয়া ঠাকুরদাসের আনন্দের সীমা রহিল না। পূর্ব্বের ন্যায় আশ্রয়দাতার বাসায় থাকিয়া নানাপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া বেতনেব দুইটী টাকা বাড়ীতে পাঠাইতে লাগিলেন। ঠাকুবদাস বুদ্ধিমান, দৃঢ়চেতা ও কার্য্যকুশল লোক ছিলেন, যেখানে যখন কর্ম্ম করিতেন, তখন সেখানকাব প্রভু তাঁহাব দৃঢ়তা, শ্রমপটুতা ও নিপুণতা দেখিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। এই জন্য তিনি কখনও কাহারও বিবাগ ভাজন হইতেন না।

দুই টাকা বেতনেব কর্ম্ম প্রাপ্তির সংবাদে, বাটীতে ঠাকুবদাসের জননী দুর্গাদেবী আনন্দে দিশাহারা হইয়া ছিলেন। দিশাহারা হইবাবই কথা। সেকালে আট আনা দশ আনায় একমণ চাউল পাওয়া যাইত। এক টাকায় এক মণ দুধ মিলিত। শাক সবজি ও তরিতব-কারি প্রায ক্রয় করিতে হইত না। সেকালে দরিদ্র লোকে টাকা প্রায় দেখিতে পাইত না, দেখিবার প্রয়োজনও হইত না। বিনা টাকায় দিন চলিত। বঙ্গের কি দুরদৃষ্ট, আমাদের কি পোড়া কপাল, এমন সুখের দিন বোধ হয় চিবদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে। বঙ্গ দেশের দগ্ধ ভাগ্যে কি সে শুভ দিন আর আসিবে না, যখন অন্নের কাঙ্গাল দীন দুঃখী জনগণ গ্রামপ্রান্তে পর্ণ-কুটীরে বসিয়া অবাধে অন্নের গ্রাস মুখে তুলিতে পারে?

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ই কেবল এই কঠিন সমস্যার মীমাংসা করিতে সক্ষম ছিলেন। কাজে ও কথায় তিনিই ইহার সদুত্তর দিয়া গিয়াছেন।

এই সময় ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম তেইশ চব্বিশ বৎসর। তর্কভূষণ মহাশয় পুত্রের বিবাহ দেওয়া আবশ্যক মনে করিয়া গোঘাট নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা-সদৃশী ভগবতী দেবীই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী। ভগবতী দেবীর পিতা তর্কবাগীশ মহাশয় সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। ধর্ম্মচিন্তা, ধর্ম্মালোচনা ও সাধনভজনেই সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে ভাল বাসিতেন। বিষয় কর্ম্মে মনোযোগ দেওয়া এবং সংসার সুখ সম্ভোগ করা অকিঞ্চিৎকর বোধে তিনি সর্ব্বদাই তাহা পরিহার করিতেন। তিনি শবসাধনে বহুকাল নিযুক্ত থাকিয়া শেষে উন্মাদগ্রস্ত হন। এজন্য পত্নী গঙ্গাদেবী লক্ষ্মী ও ভগবতী নাম্নী কন্যাদ্বয় ও উন্মাদ স্বামীকে লইয়া পাতুল গ্রামে পিতৃগৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। ভগবতী দেবী আশৈশব মাতুলালয়ে লালিত পালিত হইয়া ছিলেন। এই আদর্শ হিন্দুগৃহের ক্রিয়াকলাপ, রীতিনীতি ও ভাব ভক্তি ভগবতী দেবীর চরিত্র গঠনের প্রধানতম উপকরণ হইয়াছিল। ভগবতী দেবীর মাতামহ পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অবর্ত্তমানে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন

বিদ্যাভূষণ সহোদর ও সহোদরাদিগের লালন পালনের ভার নিজে গ্রহণ করেন। পিতার সুনাম রক্ষার জন্য ইনি নিয়ত যত্নবান থাকিতেন, হিন্দুগৃহে একান্নবর্ত্তী পরিবারে কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে, সকলেই সুখে কালযাপন করিতে পারে, এই পরিবার তাহার আদর্শস্থান বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং জননীর মাতামহ ও মাতুল পরিবারের বিষয়ে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন,—"অতিথির সেবা ও অভ্যাগতের পরিচর্য্যা এই পরিবারে যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ফল কথা এই, অন্নপ্রার্থনায় রাধামোহন বিদ্যাভূষণের দ্বারস্থ হইয়া কেহ কখনও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, ইহা কখনও কাহারও নেত্র-গোচর বা কর্ণ-গোচর হয় নাই। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে অবস্থার লোক হউক, লোকের সংখ্যা যতই হউক, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আবাসে আসিয়া সকলেই, পরম সমাদর, অতিথি-সেবা ও অভ্যাগত পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

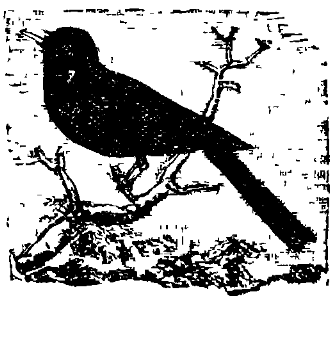
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ অতি তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। কোন ক্রমে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে কিংবা কাহারও নিকট অবমাননা ও অনাদর নীরবে সহ্য করিতে

পারিতেন না। তিনি চিরজীবন নিজ অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে শিখিয়া ছিলেন। উপকার প্রত্যাশায় কাহারও নিকট হীনতা স্বীকার কবিতেন না। অথচ তিনি অতি অমায়িক ও সদাশয় ছিলেন। ছোট বড় সকলের প্রতি সমভাবে সস্নেহ ব্যবহাব কবিতেন, যাহাবা কথায এক প্রকাব বলে, কার্য্যে তদ্বিপরীতাচবণ কবে, তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। তিনি অতি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবে এই ভযে নিজেব অভিপ্রায গোপন কবিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী, যথার্থবাদী ও হিতবাদী ছিলেন, তিনি যাহাদিগকে আচবণে ভদ্র দেখিতেন, তাহাবা হীনজাতি হইলেও তাহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিতেন, ভদ্রবেশধাবী নীচমনা লোকদিগকে তিনি ইতব শ্রেণীব লোক বলিযা আপনার মত ব্যক্ত কবিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ক্রোধেব কারণ উপস্থিত হইলে ক্রুদ্ধ হইতেন, কিন্তু কখনও ক্রোধেব পাত্রেব অনিষ্ট সাধন কবিতেন না। তাঁহাব শবীবে প্রভূত বল ছিল, একবাব মেদিনীপুব যাইবাব পথে একটা ভল্লূকের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হইযা ও তাহাকে বধ কবিয়া রুধিবাক্তকলেবরে বহু পথ অতিক্রম করিয়া মেদিনীপুরে উপস্থিত হন। তথায় কিছুকাল বোগ ভোগ কবিয়া তবে গৃহে ফিবিযা আসিতে সক্ষম হন। অনেকেই একাকী অসতর্কভাবে পথে বাহির

হইয়া দস্যু হস্তে প্রাণ হারাইত, এজন্য সকলে তাঁহাকে একাকী একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে নিষেধ করিত। কিন্তু তিনি এক লৌহদণ্ড হস্তে নির্ভয়ে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন। একদিকে যেমন তাঁহার শরীরে প্রভূত বল ছিল, অন্যদিকে তাঁহার মনেব শক্তি সামর্থ্যও তেমনই ছিল। তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, নিষ্ঠাবান ও ক্রিযাকলাপসম্পন্ন নিবীহ লোক ছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ঋষি বা যোগীব ন্যায শ্রদ্ধা কবিত। গোপনে বনমালীপুবের গৃহত্যাগের পর আট বৎসর কাল তিনি দ্বাবকা, জ্বালামুখী, বদবিকাশ্রম ও অন্য নানা তীর্থ পর্য্যটন করিযা শেষে স্বপ্ন দর্শনেব পব হইতে অবশিষ্টকাল গৃহে সন্তান সন্ততি লইয়া অতিবাহিত কবেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যে সকল ঘটনার সমাবেশ হইলে, যে সকল কাবণ বিদ্যমান থাকিলে, মানবজীবনেব প্রকৃত স্ফূর্ত্তি হয, যে সকল অবস্থায় পড়িলে, যে সকল শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত সম্মুখে থাকিলে, মানুষ উত্তব কালে উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়, ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্যে সে সকলই ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁহার পিতা ও পিতামহের দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়ণতা, অধ্যবসায, শ্রমশীলতা, আত্মনির্ভর ও নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণগুলি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পিতামহ তাঁহাকে বিষয় সম্পত্তি কিছু দেন নাই সত্য, কিন্তু এমন

কিছু দিয়াছিলেন, যাহার গুণে ঈশ্বরচন্দ্র, বিদ্যাসাগরে—গুণের সাগরে পরিণত হইযাছিলেন। আব তিনি জননীর নিকট জননীর মাতুলালয়ের দযাদাক্ষিণ্য, পরদুঃখ-কাতরতা ও পবসেবাব প্রকৃতি লাভ কবিযা ছিলেন। সে গৃহে যে দয়ার চিত্র দেখিয়া তিনি এবং তাঁহার জননী চিরমুগ্ধ ছিলেন এবং তিনি যাহা নিজে লিপিবদ্ধ কবিযা গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার মনুষ্যত্ব লাভেব মূল মন্ত্র। সেই মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া তিনি দয়ার সাগবে পবিণত হইয়াছিলেন।



তৃতীয় অধ্যায়।

শৈশবকাল।

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মগ্রহণের পর হইতে ঠাকুর দাসের সংসারের শ্রীবৃদ্ধির সূচনা হয়, এজন্য সকলেই বালককে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। বালকও সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া বাড়ীর ও প্রতিবেশি-গণের ভয়ানক অশান্তি উৎপাদন করিতে লাগিল। ইহা দর্শন করিয়া বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে গ্রামের পাঠশালায় পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। সে সময়ে বীরসিংহে কালী-কান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক গুরুমহাশয় পাঠশালা খুলিয়াছিলেন। কালীকান্ত গুরুমহাশয় বালকগণকে স্নেহ সহকারে শিক্ষা দিতেন, অথচ অল্প সময় মধ্যে অধিক শিক্ষা দিতে পারিতেন। এই দুই কারণে গ্রামের মধ্যে অন্যান্য গুরুমহাশয় অপেক্ষা তাঁহারই বিশেষ প্রতি-

পত্তি ছিল। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ঈশ্বরচন্দ্র কালীকান্ত গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় প্রেরিত হন।

পাঠশালায় এক বৎসর লেখা পড়া করার পর তাঁহার কঠিন পীড়ার সূচনা হইল। প্রথমে কিছুকাল জ্বর, তৎপরে উদরাময় ও শেষে প্লীহাজ্বর ভোগ করিয়া জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িলেন। এক সময়ে এরূপ হইয়াছিল যে, সকলেই সে যাত্রা তাঁহার রক্ষা পাওয়া সম্বন্ধে সন্ধিহান হইয়া পড়িয়াছিলেন। অন্যূন ছয়মাস কাল এইরূপ রোগ ভোগ করার পর পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হওযার আর কোন সম্ভাবনা নাই শুনিয়া, তাঁহার জননীর জ্যেষ্ঠ মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভুষণ মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিবার মানসে ভাগিনেয়ীকে পুত্রসহ আপনার গৃহে লইয়া গেলেন। তাঁহার বাসগ্রাম পাতুলের সন্নিকটে কোটরী নামক গ্রামে বহুসংখ্যক সুবিজ্ঞ কবিরাজের বাস। রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহাদেরই একজনের উপর ভাগিনেয়ী-পুত্রের চিকিৎসার ভার দিলেন। প্রায় ছয়মাস কাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক সুচিকিৎসার গুণে ঈশ্বরচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে রোগ মুক্ত হইলেন। তৎপরে অধ্যয়নার্থে বীরসিংহে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহার পর নূতন করিযা আবার কালীকান্তের পাঠশালায় লেখা পড়া করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে

আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঐ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার মেধাশক্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও শ্রমপটুতা দর্শনে গুরুমহাশয় তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুরুমহাশয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন, এবং সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার উপর গুরুমহাশয়ের অত্যধিক টান ছিল। এই তিন বৎসরে ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশালার শিক্ষা এক প্রকার সমাপ্ত করেন। এই আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র আপনার বাল-সুলভ চপলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন।

অত্যধিক দুরন্ত হইলে কি হয়, লেখা পড়ায় ঈশ্বর-চন্দ্রের অনুরাগের ত্রুটি ছিল না। গুরুমহাশয় যাহা কিছু শিখাইতেন, অতিমাত্র আগ্রহ-সহকারে অত্যল্প কাল মধ্যে তিনি তাহা শিক্ষা করিতেন। এজন্য গুরু-মহাশয় অনেক সময়ে অপরাহ্ণে অপরাপর বালকগণকে বিদায় দিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে নিকটে রাখিতেন এবং যে সকল পাঠ মুখে মুখে অভ্যাস করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিতেন। বেশী রাত্রি হইলে ঈশ্বরচন্দ্রকে নিজে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার পিতামহীর নিকট পৌঁছাইয়া দিতেন। এই সময়ে গুরুমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের পিতাকে বলিলেন, এখানকার পাঠশালায় যাহা শিক্ষা করা আবশ্যক, ঈশ্বরের তাহা হইয়াছে, ঈশ্বরের হাতের লেখা অতি সুন্দর; ইহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া ইংরাজী শিক্ষা দিলে,

ভাল হয়। এ বালক যেরূপ মেধাবী, ইহার স্মৃতি-শক্তি যেরূপ প্রবল, তাহাতে এ বালক যাহা শিখিবে, তাহাতেই যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবে।

ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের পরলোক প্রাপ্তি হয়। ছিয়াত্তর বৎসর বয়সের সময় অতিসার রোগে তিনি লোকান্তরিত হন। সেই উপলক্ষে ঠাকুরদাস পিতৃকৃত্য সমাপনার্থে গৃহে গমন করেন। এই কার্য্য শেষ হইলে পর, ঠাকুরদাস কলিকাতায় আসিবার সময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আসেন। কলিকাতায়, নিকটে রাখিয়া লেখা পড়া শিখানই পুত্রকে সঙ্গে আনিবার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আসিবার সময়ে গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও সঙ্গে ছিলেন।

বালক ঈশ্বরচন্দ্র যে উত্তরকালে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন ও পণ্ডিতগণের অগ্রণী হইবেন, বীরসিংহ হইতে কলিকাতায় আসিবার সময়ে পথে একটী ঘটনা উপলক্ষে তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন। সিয়াখালার নিকট সালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠিয়া ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, বাটনাবাটা শিলের মত এক একখানি পাথর মধ্যে মধ্যে পথের ধারে বসান রহিয়াছে। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি তাঁহার পিতাকে ইহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুরদাস পুত্রের কথায় হাসিয়া বলিলেন, "ও গুলি শিল নয়, ওকে

মাইল-ষ্টোন বলে।” তিনি বলিলেন, “বাবা মাইল-ষ্টোন কারে বলে কিছুই বুঝিলাম না।” তখন পিতা পুত্রকে বলিলেন, “ওটা ইংরাজী কথা, এক মাইল আমাদের হিসাবে আধক্রোশ, আর ষ্টোন শব্দের অর্থ পাথর। প্রত্যেক আধ ক্রোশ অন্তর ঐরূপ এক এক খানি পাথর পোতা আছে। আর কলিকাতা হইতে সেই পাথর পর্য্যন্ত কত পথ তাহাও লেখা আছে। কলিকাতার এক মাইল অন্তরে যে পাথর আছে, তাহাতে এক অঙ্ক খোদা আছে, আর এই পাথর খানিতে উনিশ অঙ্ক লেখা আছে। কলিকাতা এখান হইতে উনিশ মাইল, অর্থাৎ ৯॥ ক্রোশ।” এই বলিয়া তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে ঐ পাথর খানি ভাল করিয়া দেখাইলেন। ঈশ্বরচন্দ্র নামতার হিসাবে পাথরে হাত দিয়া বলিলেন “তবে কি এইটী ইংরাজীর এক, আর এইটী নয়?” পিতা বলিলেন, “হা তাই বটে।” তখন বালক মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, পথে যাইতে যাইতে ইংরাজী অঙ্ক শিখিবেন। উনিশ হইতে দশ পর্য্যন্ত আসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র পিতাকে বলিলেন, “বাবা আমার ইংরাজী অঙ্ক শিখা হইল। আমি এক হইতে দশ পর্য্যন্ত শিখিয়াছি।” তখন পিতা পরীক্ষার জন্য ক্রমে নয় আট ও সাত জিজ্ঞাসা করায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঠিক ঠিক বলিলেন; তবুও ঠাকুরদাসের মনে সন্দেহ রহিল, তিনি ভাবিলেন নয়ের আগে আট, আটের আগে সাত, এটা না জানিয়া

চালাকি করিয়াও একজন বলিতে পারে। সে সন্দেহ দূর করিবার জন্য ঠাকুবদাস ছয়ের অঙ্ক না দেখাইয়া একবারে পঞ্চমাঙ্কে আসিযা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হিসাব মত এটা কত হয় ?" তখন ঈশ্বরচন্দ্র পিতাকে বলিলেন, "বাবা এটা হবে ছয়ের অঙ্ক, কিন্তু ভুলে পাঁচ লিখিয়াছে।" তখন ঠাকুবদাস আনন্দিত হইয়া পুত্রকে বলিলেন, "তোমাব ইংরাজী অঙ্ক শিক্ষা হইযাছে সত্য ; আমি ইচ্ছা কবিয়া ছয়ের অঙ্ক গোপন কবিয়া গিযাছিলাম।" বালকের এতাদৃশ মেধা ও বুদ্ধি-কৌশল দেখিয়া গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ছাত্রের চিবুক ধাবণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ কবিযা বলিলেন, "বেশ বাবা বেশ।" তৎপবে ঠাকুব দাসকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "ঈশ্ববেব লেখা পড়াব ভাল বন্দোবস্ত করিবেন, যদি বাঁচিযা থাকে, এ বালক মানুষ হইবে, তাহাতে আর তিল মাত্র সন্দেহ নাই। বালক ঈশ্ববচন্দ্র পিতা ও গুরু মহাশযেব আনন্দ দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ঠাকুর দাস কতকগুলি ইংরাজী বিল ঠিক দিতেছেন, এমন সময় ঈশ্বরচন্দ্র নিকটে বসিয়া সেই কাজ দেখিতেছিলেন, পরে অতিমাত্র ব্যগ্রতার সহিত তিনি পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবা আমিও ঐ সকল বিল ঠিক দিতে পারি।"

তখন গৃহস্বামী জগদ্দুর্ল্লভ বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশ্বর তুমি কি ইংরাজী জান?" ঈশ্বরচন্দ্র পূর্ব্বদিনের মাইল ষ্টোনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আমার ইংরাজী অঙ্ক শিক্ষা হইয়াছে, আমি ঠিকের কাজ বেশ করিতে পারি।" তখন ঠাকুরদাস ও জগদ্দুর্ল্লভ বাবু উভয়েই কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া কয়েক খানি বিল ঠিক দিতে দিলেন। বালক ঈশ্বরচন্দ্র এই পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইলেন। তখন সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং ঈশ্বরচন্দ্রের লেখা পড়ার বিশেষ উপায় করিতে বলিলেন। তাঁহাদের কথার উত্তরে ঠাকুরদাস বলিলেন, আমি ঈশ্বরকে হিন্দুকালেজে দিব ভাবিতেছি। তখন কেহ কেহ বলিলেন, আপনার ১০৲ টাকা আয়, এরূপ অবস্থায় কিরূপে হিন্দুকালেজে উহাকে পড়াইবেন? তখন ঠাকুর দাস দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, ঈশ্বরের পড়ার জন্য মাসিক পাঁচ টাকা বেতন দিব, আর অবশিষ্ট ৫৲ টাকা সংসার খরচের জন্য বাটী পাঠাইব।

ইচ্ছা থাকিলেও অর্থাভাবে ঠাকুর দাস নিজে লেখা পড়া শিখিতে পারেন নাই, এজন্য চিরকাল মনে মনে ক্লেশানুভব করিতেন। এমন অবস্থায় যে বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে উপযুক্তরূপে লেখা পড়া শিখাইতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইবেন ইহাই স্বাভাবিক। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উপযুক্তরূপ

যত্নের ত্রুটি করেন নাই। সন ১২৩৫ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষে তিনি কলিকাতায় আসিয়া পিতার সহিত সিংহ মহাশয়ের বাটীতেই বাস করিতে লাগিলেন। ইহাব পূর্ব্বেই ভাগবতচবণ সিংহ দেহত্যাগ করেন। সে সময়ে তাঁহাব একমাত্র পুত্র জগদ্দুর্ল্লভ সিংহ সংসাবের কর্ত্তা। তাঁহার বয়স তখন ২৫ বৎসব মাত্র। তিনি ঠাকুব দাস বন্দ্যোপাধ্যাযকে পিতৃব্য শব্দে সম্ভাষণ কবিতেন। তদনুসাবে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে দাদা ও তাঁহাব ভগ্নীদ্বয়কে বড ও ছোট দিদি বলিয়া ডাকিতেন।

বালক ঈশ্ববচন্দ্র জননী ও পিতামহীকে ছাডিযা আসিয়া যে অত্যন্ত কাতর হইযা পডিযাছিলেন তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। কাবণ, বালক বিদেশে পবগৃহে যে ভযানক অশান্তি ও অসুবিধা ভোগ করিবে, তাহা সহজেই অনুভব কবিতে পাবা যায। কিন্তু তিনি বড় বাজারে এই সিংহ পবিবাবে যে সমাদব ও যত্নে লালিত পালিত হইযাছিলেন, তাহা তাঁহাব অমৃতময়ী লেখনীতে যেরূপ মধুবভাবে বর্ণিত হইযাছে, এখানে তাহাই উদ্ধৃত হইতেছে ;—"এই পবিবাবেব মধ্যে অবস্থিত হইয়া পবেব বাটীতে আছি বলিয়া একদিনের জন্যও আমার মনে হইত না। সকলেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি কস্মিন্‌কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র

পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নতা ছিল না। ফলকথা এই স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি, আমার হৃদয-মন্দিরে, দেবী মূর্ত্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিযাছে। প্রসঙ্গ ক্রমে, তাঁহার কথা উপস্থিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিযা অনেকে নির্দ্দেশ করিযা থাকেন। আমার বোধ হয় সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির সেই দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী, হইয়াছে সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই। আমি পিতামহী দেবীর একান্ত প্রিয় ও নিতান্ত অনুগত ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া প্রথমতঃ কিছুদিন তাঁহার জন্য যারপর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়া-

ছিলাম। সময়ে সময়ে তাঁহাকে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতাম। কিন্তু দয়াময়ী রাইমণির স্নেহ ও যত্নে আমার সেই বিষম উৎকণ্ঠা ও উৎকট অসুখের অনেক অংশে নিবারণ হইয়াছিল।”

ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতায় আনাব সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুব দাসেব দুই টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল। পূর্ব্বে আট টাকা পাইতেন, এক্ষণে দশ টাকা বেতনের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। যে বাটীতে বাসা ছিল তাহাবই নিকটে শিবচবণ মল্লিক নামক একজন ধনাঢ্য সুবর্ণবণিক বাস করিতেন। তাঁহার সদব বাটীতে এক পাঠশালা ছিল, সেখানে পাড়াব ছেলেবা লেখা পড়া কবিত। গুরুমহাশয় স্বরূপচন্দ্র দাসও শিক্ষাদান বিষয়ে বেশ নিপুণ লোক ছিলেন। ঈশ্ববচন্দ্রকে সেই পাঠশালায় দেওযা হইল। তিনি অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ তিন মাস সেই পাঠশালায় পডা শুনা কবিলেন। বীবসিংহ ও তৎপবে কলিকাতায তিন মাসে তাঁহাব পাঠশালাব পাঠ শেষ হইল। অতঃপর কোথায়, কিরূপ লেখা পডাব ব্যবস্থা করিলে, ভাল হয়, সকলে সে বিষয় চিন্তা করিতে ছিলেন, এমন সময়ে ফাল্গুন মাসেব প্রাবম্ভে ঈশ্ববচন্দ্র রক্তাতিসার রোগে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। প্রথমে ঐ পল্লীর চিকিৎসক দুর্গাদাস কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ হইল। কিন্তু রোগের উপশম না হইয়া ক্রমশঃ

বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। কলিকাতায় আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা অল্প, এইরূপ স্থির করিয়া ঠাকুবদাস বাটীতে সংবাদ দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহী ঠাকুবাণী পীড়ার সংবাদ পাইযা অত্যন্ত অধীবা হইয়া পড়িলেন; মুহূর্ত্ত-কাল বিলম্ব না কবিযা ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিবাব জন্য কলি-কাতায় আসিযা উপস্থিত হইলেন। কযেক দিন তথায় থাকিযা বালককে সঙ্গে লইযা গৃহে গমন করিলেন। বাটী যাতাযাতে জল, বাযু ও স্থান পবিবর্ত্তনে, জননী ও পিতামহীব সঙ্গলাভে এবং সমবযস্কদিগেব সম্মিলনে সপ্তাহকালেব মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আবোগ্যলাভ কবিলেন।

শচীনাম্নী এক ব্রাহ্মণকন্যা নিজ ব্যযে বীবসিংহের উত্তব প্রান্তে এক সুবৃহৎ পুষ্কবিণী খনন কবাইযা দেন। এই পুষ্করিণীব নাম "শচীবামণী"। এই শচীবামণীর তীরে গ্রাম্য বালকগণেব খেলিবাব স্থান ছিল। বাটীতে অবস্থান-কালে ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বদাই সহচব দিগকে লইযা এই শচী বামণীর তীবে খেলা করিতে যাইতেন। তাঁহার গ্রাম্য সহচর দিগের মধ্যে ২।১ জন বিশালদেহ ও বহু বলশালী ছিলেন। গদাধর পালেব নামই বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। গদাধর নামে, দেহেব আয়তনে এবং শক্তি সামর্থ্যে নিজ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ভিন্ন, অন্য কেহ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারি-তেন না। ক্রীড়াক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের আক্রমণে গদাধর

কখন কখন ধরাশায়ী হইতেন ; যখন এরূপ ঘটনা ঘটিত, তখন সকল বালকই আনন্দে দিশাহারা হইয়া করতালি ও অট্টহাস্যে পুষ্করিণী ও প্রান্তব প্রতিধ্বনিত করিত।

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যৈষ্ঠ মাসে পুত্রকে পুনরায় কলিকাতায় আনিলেন। প্রথমবাব কলিকাতায় আসিবার সময় ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য একজন ভৃত্য সঙ্গে আসিয়াছিল। কতক্ষণ চলিয়া ক্লান্ত হইলে, ঐ ভৃত্য বালককে স্কন্ধে লইযা চলিত। এবাব আসার সময়ে পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ, যদি চলিয়া যাইতে না পার, তাহা হইলে একজন লোক সঙ্গে নিতে হয়।" ঈশ্বর-চন্দ্রের দুর্বুদ্ধি ঘটিল, তিনি সাহসে নির্ভব কবিয়া বলিলেন, "না, লোক নিতে হবে না। আমি চলিয়া যাইতে পারিব" তাঁহারই কথা প্রমাণ এবাব আর সঙ্গে লোক লওয়া হইল না। পিতা পুত্রে কলিকাতা যাত্রা কবিলেন। জননীর মাতুলালয় পাতুল পর্য্যন্ত ছয ক্রোশ পথ বালক অবলীলা-ক্রমে হাঁটিয়া আসিযা সেদিন সেইখানে বিশ্রাম করিলেন।

প্রাতঃকালে পাতুল হইতে যাত্রা কবিয়া তাবকেশ্বরের নিকট বামনগব গ্রামে সে দিন বাত্রি যাপন করিতে হইবে। অর্দ্ধপথে এক দোকানে ফলাহার কবিয়া পুনরায় যাত্রা করিবার সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, "বাবা, আমি আর চলিতে পারিব না। এই দেখুন, আমার পা ফুলিয়া গিয়াছে।" ঠাকুরদাস অনেক বুঝাইয়াও কোন

মতে বালককে আর এক পাও হাঁটাইতে পারিলেন না। কিছুদূর গেলে তরমুজ কিনিয়া দিবেন বলিয়াও সম্মত করিতে পারিলেন না। শেষে বিরক্ত হইয়া অনেক তিবস্কার করিলেন। ভয় দেখাইবার মানসে কতকদূর চলিয়া গেলেন। তবুও পুত্রকে এক পা চলাইতে পারিলেন না। আর কোন উপায় না দেখিয়া শেষে আবার ফিবিযা আসিযা ক্রোধভরে বলিলেন, "যদি চল্‌তে না পার্‌বি, তবে লোক নিতে দিলি না কেন? লোক নিলে ত আর পথেব মাঝখানে এ বিপদ হইত না," এই বলিযা দুই একটা থাব্‌ড়াও দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিরুপায হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন পিতা অগত্যা পুত্রকে স্কন্ধে তুলিযা লইলেন, কিযদ্দূব গমন করিয়া ঠাকুবদাস ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ঈশ্ববচন্দ্রকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া বলিলেন, "বাবা! এইবাব খানিক দূর চল, ঐ সুমুখের দোকানে তরমুজ কিনিয়া দিব।" কিন্তু তবমুজের প্রলোভনে পা ফুলা কমিল না। বরং পাদুখানি ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম পাইয়া আরও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। ঈশ্ববচন্দ্র একেবারে চলৎ-শক্তিহীন হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরদাস অতি ক্ষীণ দেহের লোক ছিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে তিনিও ভারবহনে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। তখন সেই বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে একবার স্কন্ধে, একবার ক্রোড়ে লইয়া এবং মাঝে মাঝে বিশ্রাম

করিয়া অতি কষ্টে সন্ধ্যার পর তিনি পুত্র সহ রামনগরে ভগ্নীর গৃহে পৌঁছিলেন। একদিন বিশ্রাম করিয়া পরদিন কলিকাতা যাত্রা করিলেন। বৈদ্যবাটী আসিয়া নৌকা-যোগে কলিকাতা পৌঁছিলেন।

এবার কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুরদাস পুত্রের লেখা পড়ার নূতন ব্যবস্থা করিতে উৎসুক হইলেন। পুত্রকে ইংরাজীস্কুলে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে সকলেই একবাক্যে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। বংশের সকলেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া অধ্যাপক-মণ্ডলীর শীর্ষস্থান অধিকাব করিয়া আসিয়াছেন ; দারিদ্র্য-নিবন্ধন তিনি নিজে সে সুখে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাই ছেলেটীকে সংস্কৃত শিক্ষা দেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র বাসনা। তিনি মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত শিক্ষা কবিয়া বাটীতে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা কবিয়া দেশ বিদেশের বালকবৃন্দকে সংস্কৃত বিদ্যা দান করিবেন। এই জন্য আত্মীযবর্গের কোন পরামর্শই তাঁহার মনঃপূত হইল না। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃমাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পিতৃব্য পুত্র মধুসূদন বাচস্পতি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারই উৎসাহ ও পরামর্শে ঠাকুরদাস পুত্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে নব বৎসর বয়সের সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সংস্কৃত পাঠের সূচনাই হয় নাই। কিন্তু তিনি বিদ্যালয়ে প্রবেশের দিন হইতে তাঁহার শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালক হইলেন। হালিসহরের অনতিদূরবর্ত্তী কুমারহট্ট পল্লীনিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ের উপর ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপনার ভার ছিল। তিনি বিশিষ্টরূপ আগ্রহসহকারে বালকগণকে শিক্ষা দিতেন এবং শিক্ষা দান বিষয়ে তাঁহার সম্যক পারদর্শিতা ছিল। ছাত্রগণকে পুত্রবৎ স্নেহসহকারে শিক্ষাদান বিষয়ে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

তর্কবাগীশ মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের স্মরণশক্তি, অধ্যবসায় ও বিদ্যাশিক্ষায় অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কালেজে প্রবিষ্ট হওয়ার ছয় মাস পরে যে পরীক্ষা হইল, তাহাতে ঈশ্বরচন্দ্র পাঁচ টাকা বৃত্তি পাইলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত মধুসূদন বাচস্পতিও সর্ব্বদা ঈশ্বরচন্দ্রের তত্ত্বাবধান করিতেন। পিতা প্রতিদিন বেলা ৯টার সময়ে বড়বাজারের বাসা হইতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পটলডাঙ্গার কালেজ বাটীতে পৌঁছাইয়া দিতেন এবং বেলা চারিটার সময়ে নিজে আসিয়া বালককে বাসায় লইয়া যাইতেন। বিদ্যালয়ে তাঁহার উপর স্নেহ সহকারে দৃষ্টি রাখিবার লোক ছিলেন এবং পিতা নিজে তাঁহাকে পথে যাতায়াতে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন বলিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র অল্প বয়সে মন্দ বালকের সঙ্গ লাভের সুযোগ পান নাই। অনেক কোমলমতি, সরলচিত্ত ও বুদ্ধিমান বালক অসৎসঙ্গে পড়িয়া সর্ব্বদাই বিনষ্ট হয় এবং উত্তরকালে সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্র লাভে বঞ্চিত হইয়া আপনার ও আত্মীয়গণের সর্ব্বনাশ সাধন করে। বিশেষতঃ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় ধর্ম্মশীল কর্ত্তব্যপরায়ণ ও পুত্রবৎসল পিতার অভাবে বর্ত্তমান বঙ্গ সন্তানগণ দুর্নীতি, দুরাচার ও কুশিক্ষার ঘৃণিতপথে বিচরণ করিয়া বঙ্গগৃহের ও বঙ্গদেশের প্রভূত অমঙ্গল সাধন করিতেছে। ঠাকুরদাসের ন্যায় শ্রমশীল, কষ্টসহিষ্ণু, ন্যায়নিষ্ঠ ও সন্তান-

বৎসল পিতার সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি হয়, আপাততঃ আমাদের সেই দিকেই বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

ক্রমে ঠাকুরদাস যখন বুঝিলেন যে ঈশ্বরচন্দ্র একাকী পথে যাইতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং একাকী গেলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না, তখন তাঁহাকে একাকী যাইতে দিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষুদ্রাবয়ব-সম্পন্ন ছিলেন। বালক যখন পথে একাকী একটী ছাতি মাথায় দিয়া পড়িতে যাইতেন, তখন দূর হইতে দেখিয়া বোধ হইত, যেন পথে একটী ছাতিই যাইতেছে, ছাতির মধ্যে কেহ আছে বলিয়া বোধ হইত না। ঈশ্বরচন্দ্রের বৃহৎ মাথাটী এই ক্ষুদ্র দেহের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল; সেই অল্লায়তন দেহের পক্ষে মস্তকটী একটী বৃহৎ ভার বলিয়া বোধ হইত, এজন্য বিদ্যালয়ের অন্যান্য বালকেরা ঈশ্বরচন্দ্রকে "যশুরে কৈ" বলিয়া তামাসা করিত, কখন কখন আবার উল্টাইয়া 'কসুরে জৈ' বলিত; আর বালক ঈশ্বরচন্দ্র রাগিয়া যাইতেন, তিনি যতই রাগ করিতেন, বালকেরা ততই তাঁহাকে ঐরূপে খেপাইত। তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধির আর এক কারণ ছিল। তিনি রাগিলে আর কথা কহিতে পারিতেন না। কারণ বাল্যকালে তিনি তোত্‌লা ছিলেন।

কালেজে প্রবেশের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিদিন যাহা পড়িতেন, গৃহে আসিয়া পিতার নিকট পুনরায় তাহার আবৃত্তি করিতে হইত। একটী

কথা এদিক ওদিক হইলে আর নিস্তার থাকিত না। যাহা পড়িতেন তাহা অবিকল শুনাইতে হইত। কখন কখন অনেক পুরাতন পাঠও একবারে শুনাইতে হইত। ভ্রম-বশতঃ একটী কথা বলিতে বিস্মৃত হইলে, ঠাকুরদাস অমনি ধরিতেন। ঠাকুরদাস এরূপ ভাবে বালকের পাঠ লইতেন যে, ঈশ্বরচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে,পিতা ব্যাকরণে তর্কবাগীশ মহাশয়ের সমান পণ্ডিত। ফলতঃ পিতা, পুত্রের পাঠ শুনিতে শুনিতে ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁহার বয়সের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম করিতে হইত। সে পরিশ্রমের ত্রুটি হইলে তাঁহাকে পিতার নিকট অত্যধিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া তিনি কখন কখন পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িতেন। পিতা রাত্রিকালে কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া যদি দেখিতেন যে, প্রদীপ জ্বলিতেছে আর তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে আর তাঁহার অব্যাহতি ছিল না। কোন কোন দিন এতই প্রহার করিতেন যে, সে গৃহের স্ত্রীলোকেরা, বিশেষভাবে রাইমণি, বালকের সাহায্যার্থে ছুটিয়া আসিতেন এবং কোন কোন দিন প্রহারের অসহনীয় দৃশ্যে কাতর হইয়া ঠাকুরদাসকে বাসা পরিবর্ত্তন করিতে বলিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র এইরূপ প্রহারের ভয়ে

নিদ্রার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অনেক সময়ে চক্ষুতে প্রদীপের তৈল দিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেন এবং এই উপায়ে রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক পড়া শুনা করিতেন। ইহাব উপর ঠাকুবদাস রাত্রিশেষে বালকের ঘুম ভাঙ্গাইয়া বহুবিধ জ্ঞাতব্যবিষয়ক উদ্ভট কবিতা মুখে মুখে শিখাইতেন। ঈশ্বরচন্দ্র এই প্রকারে পিতার নিকট প্রায় দুই তিন শত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। অপর দিকে শিক্ষক তর্কবাগীশ মহাশয়ও বালকের অত্যাশ্চর্য্য মেধা দর্শনে পরম যত্নে বিবিধ-বিষয়ক সংস্কৃত শ্লোক মুখে মুখে শিখাইতেন এবং অন্বয় ও অর্থ বলিয়া দিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র তিন বৎসরকাল ব্যাকবণ শ্রেণীতে পাঠ করেন। দুই বৎসর পরীক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ফললাভ করিয়াছিলেন। একবার উৎকৃষ্টরূপ পরীক্ষা দিয়াও আশানুরূপ পুরস্কার না পাইয়া একেবারে ভগ্ন-মনোরথ হইয়া পড়েন এবং বিদ্যালয়েরউপর বীত-শ্রদ্ধ হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি যখন যাহা ধরিতেন, কেহ তাহা হইতে সহজে তাঁহাকে বিরত করিতে পারিত না। জেদের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া দেশে গিয়া সার্ব্বভৌমের টোলে সংস্কৃত শিক্ষা কবা স্থির করিলেন। সহজে কেহই তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত করিতে পারিলেন না। অবশেষে তর্কবাগীশ মহাশয়ের স্নেহানুবোধে ও বাচস্পতির আত্মীয়তায়

বাধ্য হইয়া সার্ব্বভৌমের টোলে পড়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া পিতার অভিপ্রায় মত কালেজেই পূর্ব্ববৎ পড়িতে লাগিলেন।

সেইবারকার পরীক্ষায় ফল মন্দ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, সেইবার একজন সাহেব পরীক্ষক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ত্বরিত উচ্চারণে অক্ষমতা প্রযুক্ত ধীরে ধীরে পরীক্ষাদান ও কথা সকল পরস্পর হইতে পৃথক ভাবে বিলম্বে উচ্চারিত হওয়া পরীক্ষক সাহেবের নিকট একটা বিশেষ দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ সাহেব স্থানে স্থানে বুঝিতেও ভুল করিয়া থাকিবেন। এই জন্য তাঁহার পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র সেবার প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। ইহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ তিনি বিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। কোন বালক শ্রমশীলতায়, দৃঢ়তায় বা বুদ্ধি প্রকাশে তাঁহাকে পরাজিত করে, ইহা তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। যেখানে পরাজয়ের সম্ভাবনা অধিক ঈশ্বরচন্দ্রের জয়লাভের উত্তেজনা ও আয়োজন সেখানে তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক হইত। এই বালক কি শৈশবে, কি পঠদ্দশায়, কি উত্তরকালে কর্ম্মক্ষেত্রে কিংবা অন্য কোন বিশেষ ঘটনাতে কোথাও কাহারও পশ্চাতে পড়িতে ঘৃণাবোধ

করিতেন। চিরদিন সমভাবে আপনার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইয়াছেন। এবং তাঁহার সে চেষ্টা সর্ব্বত্রই তাঁহার আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফল প্রদান করিযা তাঁহাব প্রতিভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিযাছে। কখনও কাহাবও অনুগ্রহ ভাজন হইবার প্রবৃত্তি কেহ তাঁহাতে দেখে নাই। যে আত্ম-নির্ভরতার গুণে তিনি সর্ব্বত্র জয়ী হইয়াছেন, বিদ্যালয়ে পঠদ্দশাতেই তাঁহার সে গুণ সমধিক স্ফূর্ত্তি লাভ করিযাছিল।

সংসাবে অন্য দশজনেব অনুগ্রহ ভাজন না হইয়া, অন্যেব সহাযতা লাভ না কবিয়া, জীবনের পথে অগ্রসর হওযা অতীব কঠিন কার্য্য, বিশেষতঃ নিরন্ন দরিদ্র বালকের পক্ষে এরূপ আত্মনির্ভরতা আবও বিচিত্র ব্যাপার বলিযা বোধ হয়। উত্তরকালে বহুবন্ধু-পরিবেষ্টিত হইযাও, তিনি একাকী জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, তাঁহার মত গরিব অতি অল্পই হয। তাঁহার পিতা যে ভাবে দুঃখ কষ্টের সহিত সংগ্রাম কবিয়া জীবনেব পথে তিল তিল করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে সামান্য আয়ে বহু পরিবারের ভরণপোষণ সঙ্কুলান হইত না বলিয়া বাল্যকালে তাঁহাকে অনেক সময়ে উদরান্নের জন্য অত্যন্ত

কষ্ট পাইতে হইত। তাঁহার নিজের বর্ণিত দুঃখ কাহিনী যে কিরূপ হৃদযবিদারক তাহা সহৃদয় লোক কেবল অন্তরে অনুভব করিতে সক্ষম। লেখনী সে দুঃখের বার্ত্তা বর্ণন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তিনি বলিয়াছেন কখন অন্ন জুটিত, কখন জুটিত না। যখন জুটিত তখনও সকল সময়ে পেট ভবিযা খাইতে পাইতেন না। যখন পেট ভরিয়া অন্ন জুটিত, তখন আবার অনেক সময়ে ব্যঞ্জনের অভাবে, কেবল নুন ভাতে, দিনপাত কবিতেন। যখন তরকাবী ও মৎস্য পাইতেন,তখন মৎস্যেব ঝোল বাঁধিয়া এক বেলা ভাত আব সেই ব্যঞ্জনেব ঝোল খাইযা, বৈকাল বেলাব জন্য তরকাবী ও মৎস্য বাখিযা দিতেন। বৈকালে সেই ব্যঞ্জনের তবকাবীব দ্বাবা অন্ন উদরস্থ করিয়া মাছ গুলি পবদিনেব জন্য রাখিযা দিতেন। পরদিন সেই মাছেব অম্বল বাঁধিয়া তাহাব দ্বারাই সেদিনকার আহার সমাপন কবিযা পরিতৃপ্তি লাভ কবিতেন। এইরূপ ক্লেশে পড়িয়া দিবাবাত্রি শ্রম কবিয়া যে বালক জীবনেব পথে অগ্রসব হইতে প্রাণপণে যত্ন করে বিধাতা প্রসন্ন হইয়া তাহার উপযুক্ত পুরস্কার বিধান করিযা থাকেন। বিদ্যা-সাগর মহাশয় যে উত্তরকালে দয়াব প্রতিমূর্ত্তি হইয়া সংসাবে বিচরণ করিযাছেন, তাঁহার সেই অসাধ্য সাধনের প্রথম অঙ্কুব বিদ্যালয়ে বাল্যসহচরদিগের পরিচর্য্যার মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। পিতা দরিদ্র, নিজে সর্ব্বদা

উদর পূর্ণ আহার পাইতেন না, অথচ বিদ্যালয়ে যে বৃত্তি পাইতেন, সময়ে সময়ে তাহারও কিছু কিছু অন্য সহাধ্যায়ীদিগের সাহায্যার্থে ব্যয় করিতেন। কাহারও পীড়া হইয়াছে শুনিবামাত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। নিজে বাড়ীতে চরখা-কাটা সূতায় প্রস্তুত মোটা চটের মত কাপড় পরিয়া নিজের অর্থে অন্য দরিদ্র বালকদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভদ্রতর পরিধেয় ক্রয় করিয়া দিতেন। বালকের কথা দূরে থাকুক, পরিণত বয়সের সুপ্রবীণ ব্যক্তির পক্ষেও স্বার্থত্যাগের এরূপ আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত লোক সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপে তিনি সেই বাল্যকালেই নিজের দুরবস্থা বিস্মৃত হইয়া অন্যের সেবায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিতেন। একদিকে অনাহার ও অনিদ্রা জনিত দুঃখ কষ্ট, শ্রাবণের ধারার ন্যায় তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইত, অন্যদিকে তাহার উপর গৃহের পাকাদি কার্য্যের ভার তাঁহারই উপর ছিল, তাহার উপর আবার দশজনের সংবাদ লইয়া ও সেবা করিয়া বিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করা কিরূপ বালকের পক্ষে সম্ভব, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেই পারি না। সমগ্র সভ্য জগতের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও এরূপ দরিদ্র বালকের এ প্রকার ক্লেশ ও অসুবিধার ভিতরে, এরূপ পরসেবা ও স্বার্থত্যাগের ভিতরে, আত্মো-

স্মৃতি সাধনের এমন উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। একান্ত বিরল—অতি দুর্লভ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

আপামর সাধারণ লোকের পক্ষে যেটী প্রধান দোষ, প্রতিভাশালী ক্ষমতাবান লোকের পক্ষে তাহাই প্রধান গুণে পরিণত হয়। অন্য লোক নিজের বিদ্যা বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে, নিজের জেদের বশবর্ত্তী হইলে, অপর দশজনের অনুরোধ উপেক্ষা করিলে, নিন্দা-ভাজন হয়; কিন্তু সংসারে কখন কখন দেখা যায় যে, দশজনের বা শতজনের বিদ্যা বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম দর্শন একত্র করিলেও প্রতিভাশালী মহাত্মাদের কণামাত্রও হয় না। কাজে কাজেই তাঁহারা নিজের উপর অধিক নির্ভর করিতে শিখিয়া থাকেন। বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরচন্দ্রের ঐরূপ আত্মনির্ভরতার ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কাহারও সাহায্য না লইয়া বিদ্যালয়ে তিনি সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছাত্র হইবেন, সর্ব্বদা সেইরূপ প্রতিজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত হইতেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালক হইতে হইলে যত প্রকার ক্লেশ ভোগ করার প্রয়োজন, তাহাতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। সে বিষয়ে কাহারও বাধা মানিতেন না। অনেক সময়ে অর্দ্ধ রজনী, কোন কোন সময়ে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া লেখা পড়া করিতেন; একপ পরিশ্রমে অনেক সময়ে তিনি অত্যন্ত কঠিন পীড়ায়

অনেক দিন ধরিয়া শয্যাগত থাকিতেন। কিন্তু. তথাপি আত্মোন্নতি-সাধনে কখনও এক মুহূর্ত্তের জন্য বিরত ছিলেন না। উত্তরকালে যখন তিনি সম্মান ও সম্পদের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, যখন তাঁহার শরীর অসুস্থ ও অপটু হইয়া পড়িয়াছিল, যখন তিনি জনসমাজের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য কলাপের সহিত বড় সংস্রব রাখিতেন না, তখনও দেখা গিয়াছে একাহারে, অনাহারে বা রুগ্নশরীরে সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। কোন নূতন বিষয় জানিবার জন্য, কোন নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার জন্য, কোন নূতন পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য সর্ব্বদাই মুক্তভাবে অপেক্ষা করিতেন। কেহ কোন বিষয়ে তাঁহাকে পরাস্ত করিবে, ইহা তিনি কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেন না। এই দুর্দ্দমনীয় আত্মোন্নতির স্পৃহা ও আত্মাদরের ভাব বাল্যকালে বিদ্যালয়ে অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আত্মনির্ভরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার দর্শনলাভাকাঙ্ক্ষায় বহুবার তাঁহার গৃহে গিয়াছি। কিন্তু কখনও তাঁহাকে চেয়ারে পৃষ্ঠ রাখিয়া বসিতে দেখি নাই। সুস্থতায় কি পীড়ায়, আহারে কি অনাহারে সকল সময়েই তিনি সোজা হইয়া বসিতেন, তাঁহার উপবেশনে ক্লান্তিবোধক চিহ্ন কখন দেখিতে পাই নাই। তাঁহার লোকান্তর গমনের পূর্ব্ব দিনও তিনি আপনার নিতান্ত

প্রযোজনীয় কার্য্যগুলি নিজে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন ব্যাকরণ-শ্রেণীর পাঠ শেষ করিযা সাহিত্য-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, সে সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ মাত্র। সাহিত্যশ্রেণীতে প্রবেশ কালে তাঁহার উপনয়নসংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হয। তিনি যখন সাহিত্য-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন সেই শ্রেণীর শিক্ষক জযগোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় বালকের বয়সের অল্পতা হেতু তাঁহাকে লইতে প্রথমে আপত্তি করিযা ছিলেন। তাঁহার এইরূপ সন্দেহ হইযাছিল যে এত অল্প বযসের ছেলে সংস্কৃত সাহিত্য বুঝিতে পারিবে না। ঈশ্বরচন্দ্র অতিশয অভিমানী ছিলেন। এই কথা শুনিবামাত্র বলিলেন, “সাহিত্য বিষযেই আমাকে পরীক্ষা করিযা লইলে ভাল হয নতুবা আমাকে বিদ্যালয ত্যাগ করিযা চলিযা যাইতে হইবে।” তদনুসারে তর্কালঙ্কার মহাশয ঈশ্বরচন্দ্রকে ভট্টির কযেকটা কঠিন কবিতার অর্থ করিতে বলিলেন। তিনি সে সকল কবিতার যেরূপ অর্থ ও অন্বয করিযা দিযাছিলেন, তাঁহার অপেক্ষা বযোজ্যেষ্ঠ সকলের কেহই সেরূপ সুব্যাখ্যা ও পাঠের সেরূপ অন্বয সাধন করিতে পারেন নাই। তখন তর্কালঙ্কার মহাশয পরিতুষ্ট হইয়া বালককে সাহিত্য-শ্রেণীতে গ্রহণ করিলেন এবং চিরদিন পুত্রবাৎসল্যের সহিত শিক্ষাদান করিতেন।

এই শ্রেণীতে পরলোকগত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক ছাত্রেরাই তাঁহাব সহাধ্যায়ী ছিলেন।

ঈশ্ববচন্দ্র এই শ্রেণীব প্রথম বর্ষে রঘুবংশ, কুমার সম্ভব ও রাঘবপাণ্ডবীয় প্রভৃতি সাহিত্য গ্রন্থেব পবীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় বৎসরে মাঘ, ভারবী, মেঘদূত, শকুন্তলা, উত্তরবামচরিত, বিক্রমোর্ব্বশী, মুদ্রাবাক্ষস, কাদম্বরী, ও দশকুমাব চরিত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ সকল আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ কবিয়া শেষ পরীক্ষায় সকলকে পশ্চাতে বাখিয়া প্রথম স্থান অধিকার কবিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রগণ সকলে তাঁহার পরীক্ষার ফল দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

সে কালে এখনকাব মত রবিবাবে সংস্কৃত কালেজ বন্ধ হইত না। প্রতিপদ ও অষ্টমীতে সংস্কৃত চর্চ্চা নিষিদ্ধ ছিল, এজন্য প্রতিপদ ও অষ্টমীতে কালেজ বন্ধ থাকিত। দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নূতন পাঠ বন্ধ থাকিত; এ কারণ ঐ কয়েক দিবস সংস্কৃত রচনা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কোন কোন দিন সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা অথবা বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃত অনুবাদ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। ঈশ্বরচন্দ্র এই সর্ব্বপ্রকার অনুশীলনেই সকল বালক অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শিতা দেখাইতেন বলিয়া, শিক্ষক তর্কালঙ্কার মহাশয়

তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার কল্যাণ চিন্তা করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা ও অনুবাদে বর্ণাশুদ্ধি কিংবা ব্যাকরণ-দোষ থাকিত না, তাঁহাব হাতেব লেখা অতি সুন্দব ছিল, এবং যাহা কিছু পাঠ করিতেন তাহা সম্যক স্মবণ কবিযা রাখিতেন বলিয়া কখনই তাঁহাকে কোন বিষযে পবাস্ত হইতে হইত না। তাঁহার স্মৃতি শক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ কবিযা জীবনেব অধিকাংশ ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন কবিতে পাবিতেন। আমবা অনেক সময়ে তাঁহাব চবণ প্রান্তে বসিষা তাঁহাব বর্ণিত বিষয় হইতে অনেক ঘটনা সংগ্রহ কবিয়া বাখিযাছি।

তিনি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ সকল আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ কবিযা রাখিতেন এবং নানা বিষযক সংস্কৃত পদাবলী সংগ্রহ ও স্মবণ কবিযা রাখিতেন বলিযা, অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে পাবিতেন। সে সমযকার পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাব এই অসাধাবণ ক্ষমতা দর্শনে বলিতেন, "ঈশ্বব শ্রুতিধব, এ বালক দীর্ঘজীবী হইলে অদ্বিতীয় লোক হইবে।"

এই সময় ঠাকুবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার মধ্যম পুত্র দীনবন্ধুকে সংস্কৃত কালেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিবার মানসে কলিকাতায আনিলেন। কলিকাতাব বাসায় ক্রমে পবিবার-[illegible] ঈশ্বর-

চন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গৃহকার্য্যের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা রন্ধন কার্য্য সমাপন করিতে হইত। বাসায় দাস দাসী ছিল না, প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবার সময় কাশীনাথ বাবুর বাজারে গিয়া মৎস্য ও তরকারী ক্রয় করিয়া লইয়া বাসায় আসিতেন। বাসায় আসিয়া ব্যঞ্জনের ঝাল মস্‌লা নিজেই বাটিতেন, তরকারী ও মাছ নিজেই কুটিতেন। পাকের কার্য্য একাকীই সম্পন্ন করিতেন। চারি পাঁচ জনের আহারের আয়োজন করিয়া, তাঁহাদিগকে আহার করাইয়া ও নিজে আহার করিয়া, সে সকল ভোজন-পাত্র ধৌত করিতেন, আহারের স্থান পরিষ্কার করিতেন। তৎপরে কালেজে যাইতেন। এ সকলের উপর ঠাকুরদাসের নিয়ম ছিল যে, একটী ভাত পাতের পাশে পড়িয়া থাকিবে না, ভোজন-পাত্র ধুইয়া মুছিয়া খাইতে হইবে। সে বিষয়ে কখন ত্রুটি হইলে, গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইত। এইরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া, তিনি উত্তরকালে নির্ভয়ে শান্ত চিত্তে সকল বিপদ ভার বহন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কেহ কখন তাঁহাকে বিপদে বা রোগে অসহিষ্ণু হইতে দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

বাল্যকালে এই সকল রীতিনীতির অধীন হইয়া

চলিয়া ছিলেন বলিয়া, পরিণত বয়সেও তিনি কখন একটী ভাত ফেলিতেন না, এবং কাহাকেও ফেলিতে দিতেন না। যখন কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতেন, তখন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্নের আয়োজন করিতেন, নিজে নিকটে বসিয়া নিমন্ত্রিত গণকে আহার করাইতেন, কেহ কিছু ফেলিয়া রাখিলে, তাঁহার পিতৃদেবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন;--"একটী ভাত পাতের পাশে পড়িয়া থাকিলে, আমার বাবা আমাকে প্রহার করিতেন, আর তুমি এত জিনিস নষ্ট করিবে? তা কখন হবে না, ও গুলি সমস্ত খাইতে হইবে।"

ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যম সহোদর দীনবন্ধুকে তাঁহার পিতা কালেজের ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। দীনবন্ধু ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় শ্রমশীল ছিলেন না। অনেক সময়ে অলসভাবে কাল কাটাইতেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন বালক ছিলেন। যাহা একবার শুনিতেন তাহাই তাঁহার মনে থাকিত। ঠাকুরদাস রাত্রি নয়টার পর কর্ম্মস্থান হইতে বাসায় আসিতেন, বাসায় আসিয়া দুইটী ভাইকে লেখা পড়া করিতে দেখিলে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। আর যদি দেখিতেন যে, প্রদীপ জ্বলিতেছে আর দুই ভাই ঘুমাইতেছেন তাহা হইলে আর নিস্তার থাকিত না। পিতার প্রহারে বালকদ্বয়ের ক্রন্দনে কাতর হইয়া সিংহ মহাশয়ের পরিবারেরা দৌড়িয়া আসিতেন।

অনেক দিন হইতে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে এই বাসনা ছিল যে, বালক ঈশ্বরচন্দ্র কালেজের শিক্ষা সমাপন করিয়া বীরসিংহে গিয়া টোল করিবেন, এবং গ্রামের ও অন্যান্য স্থানের নিরাশ্রয় বালকবৃন্দ সমবেত হইয়া সেই টোলে অধ্যয়ন করিবে। এইরূপ আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া ঠাকুরদাস পুত্রকে বলিলেন, কালেজে তুমি যে বৃত্তি পাইতেছ, তাহার দ্বারা দেশে কিছু জমি ক্রয় কর, তাহার আয় দ্বারা বিদেশীয় বালকগণের ভরণ পোষণের ব্যয় সঙ্কুলান হইবে। তদনুসারে ঈশ্বরচন্দ্রের বৃত্তির টাকা দিয়া কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ক্রয় করা হইয়াছিল। কিছুকাল জমি জমা ক্রয় করার পর পিতা পুত্রকে বলিলেন, অতঃপর বৃত্তির টাকা দিয়া কিছু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ক্রয় কর। পিতার আদেশ মত কতকগুলি হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ ক্রয় করা হইয়াছিল। অদ্যাপি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরীতে সে পুঁথিগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যা শিক্ষা শেষ হইলে, গ্রামে অনাথ বালকদিগের জন্য টোল করিতে হইবে, পিতা পুত্র উভয়েরই সেরূপ বাসনা ছিল এবং পূর্ব্ব হইতে তাহার আয়োজন হইতে ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র ইতি মধ্যেই ব্যাকরণ ও সাহিত্যে বিশিষ্ট-রূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়া ছিলেন। এই সময় অবসর ক্রমে যখন বীরসিংহে গমন করিতেন, শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে কাহারও কোনও নিমন্ত্রণের শ্লোক রচনার প্রয়োজন হইলে,

তিনি তাহা রচনা করিয়া দিতেন। একবার এক সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কৃতী ঈশ্বরচন্দ্রের দ্বারা শ্লোক রচনা করাইয়া লন। সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলী সেই শ্লোকের রচনা-পারিপাট্য, শব্দবিন্যাস ও পদলালিত্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কবিতাকারের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন কর্ম্মকর্ত্তা বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখাইয়া দিলেন। সকলে বালকের এতাদৃশ ক্ষমতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া গেলেন। কেহ কেহ তাঁহার সহিত ব্যাকরণের বিচার করিতে গিয়া দেখিলেন, বালক অনর্গল সংস্কৃতে কথা কহিতে ও বিচার করিতে পারেন। তখন সভাস্থ সকলে বালকের এতাদৃশ ক্ষমতা দর্শনে তাঁহাকে আশী-র্ব্বাদ করিয়া নীরব হইলেন। সেই সময় হইতে বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্ত্তী নানা স্থানে প্রচারিত হইল যে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র এক অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন। অল্পকাল পরে, এদেশে আর কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে না। সে সময়ে এই বালক ঈশ্বরচন্দ্রের প্রশংসাবার্ত্তা নানা দিকে প্রচারিত হইবার প্রধান কারণ এই যে, তিনি বাঙ্গালা ভাষার মত সংস্কৃত ভাষায় অবাধে কথা কহিতে ও যে কোন প্রকার আলোচ্য বিষয়ের বিচার করিতে পারিতেন, কিন্তু সে সময়ের প্রবীণ সুবিদ্বান্ পণ্ডিতগণের পক্ষেও সংস্কৃত ভাষায় সে প্রকার বিচার করা সম্ভবপর ছিল না; তাই সকলে

বালকের এতাদৃশ ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ ও নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে অলঙ্কারের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় অলঙ্কারের অধ্যাপক ছিলেন। ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার এই তিন বিষয়েই তর্ক-বাগীশ মহাশয় সমান পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া বালকেরা সংস্কৃত ভাষায় বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিত। অলঙ্কার শ্রেণীতেও ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু কাজের বেলায় সকলের অপেক্ষা ওজনে ভারি হইতেন; এজন্য শিক্ষক, দর্শক ও অন্যান্য সকলে তাঁহার বালকত্ব ও প্রবীণত্বের মিলন দেখিয়া তাঁহাকে অদ্ভুতকর্ম্মা বালক মনে করিয়া অবাক হইতেন। তিনি এক বৎসরের মধ্যে সাহিত্য-দর্পণ, কাব্য প্রকাশ ও রসগঙ্গাধর প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করেন এবং বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

এই সময়ে পরীক্ষার জন্য তাঁহার অতি কঠিন পরিশ্রম করিতে হইত, সঙ্গে সঙ্গে আবার বাসার সর্ব্ব প্রকার কার্য্যের ভার তাঁহার উপর থাকায়, তিনি পরীক্ষার পরে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। অনবরত রক্ত ভেদ হইতে লাগিল। কলিকাতায় থাকিয়া নানাপ্রকার

ঔষধ সেবন করিয়াও পীড়ার প্রকোপের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। অগত্যা কিছুদিনেব জন্য বিদায লইয়া বীরসিংহে গেলেন। সেখানেও প্রথমে নানা প্রকাব ঔষধ সেবনে আরোগ্য লাভ করিতে পাবেন নাই। শেষে একজন ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ ওল, ঘোলের সহিত মিশাইযা কয়েকদিন খাওযাইয়া সেই কঠিন পীডা হইতে তাঁহাকে মুক্ত করেন। সেই দারুণ পীড়াব হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে না পাইতে তিনি পুনবায কলিকাতায় আসিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় শ্রমকব কার্য্যগুলিব ভাব নিজেই লইলেন।

এই সমযে একদিন তিনি দীনবন্ধুকে সন্ধ্যার সময়ে বাজাবে পাঠাইযা দেন, কিন্তু বাত্রি একাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত সহোদব দীনবন্ধু ফিবিল না দেখিযা তাঁহার অত্যন্ত ভয় ও ভাবনা হইল। ভ্রাতার জন্য উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে অন্যান্য সকলের পরামর্শ মত কাশীনাথ বাবুর বাজারে গিযা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেখানে কোন সন্ধান না পাইয়া তাঁহার আশঙ্কা আবও দৃঢমূল হইল। তিনি অতি ব্যাকুলভাবে বড়বাজাব হইতে নূতনবাজারে দীনবন্ধুর সন্ধানে গেলেন। সেখানে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, এক দেওয়ালে ঠেস্ দিযা বালক নিদ্রা যাইতেছে। ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহাকে বাসায লইয়া গেলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত

ভাই ও ভগ্নীগুলিকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং সর্ব্বদা তাঁহাদের কল্যাণ চিন্তা করিতেন। আস্থাবান হিন্দুগণ যেরূপ ভক্তি সহকারে দেব পূজা করেন, তিনি সেইরূপ ভক্তি সহকারে নিজ জনক জননীর পূজা করিতেন, তিনি বলিতেন সংসারে পিতা মাতাই জীবন্ত দেবতা। পিতৃ-মাতৃ-পূজা ত্যাগ করিয়া বা পিতা মাতার প্রতি, তাঁহাদের নানা প্রকার দুঃখ কষ্টের প্রতি উদাসীন হইয়া, দেবপূজায় ধর্ম্ম হয় না। যাঁহাদের দুঃখ কষ্টে আমরা লালিত পালিত, যাঁহাদের স্নেহ মমতায় আমরা সুরক্ষিত, সেই পিতা মাতা যদি দেবতা স্থানীয় না হন, তবে অন্য দেবতার পূজায় ধর্ম্ম হয় না। বস্তুতঃ আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত পিতৃমাতৃ ভক্ত লোক সচরাচর দেখিতে পাই না।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন কোন কার্য্যোপলক্ষে বীর সিংহ গমন করিতেন, সর্ব্বাগ্রে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় গুরুমহাশয়ের চরণ বন্দনা করিতে যাইতেন। গুরুমহাশয় ঈশ্বর চন্দ্রের এতাদৃশ লোকবিরল অনুরাগপূর্ণ ভক্তি দর্শনে স্নেহবিগলিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। দেশের কি ইতর, কি ভদ্র সকল লোকই তাঁহার সপ্রেম ব্যবহার ও করুণ-রসপূর্ণ মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিত। বাটীতে অবস্থান কালে তিনি ছোট ছোট বালক-গণকে লইয়া কপাটী খেলিতেন, সমবয়স্ক দিগকে লইয়া লাঠি খেলিতেন ও কুস্তি করিতেন এবং বয়োজ্যেষ্ঠদিগের

সম্মান করিয়া চলিতেন। এরূপ সুপ্রকৃতি সম্পন্ন যুবককে যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই স্নেহনয়নে দেখিবেন ইহাই স্বাভাবিক। ঈশ্বরচন্দ্র তাস পাসা প্রভৃতি, অলস ক্রীড়া ও আমোদের পক্ষপাতী ছিলেন না। চঞ্চল বালকের প্রকৃতি, উদ্যমশীল যুবকের স্বভাব এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ তেজস্বী পুরুষের লক্ষণ পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার চরিত্রে স্থান পাইয়াছে। তিনি সর্ব্বদা সেইরূপ প্রকৃতির অনুগত হইয়া চলিতেই প্রয়াস পাইতেন ও ভাল বাসিতেন।

ঠনঠনিয়ার চৌরাস্তায় অনতিদূরে পূর্ব্বদিকে একটী বাসায় সংস্কৃত কালেজের কয়েকজন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র বাস করিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এই জন্য প্রায় প্রতিদিন বিদ্যালয়ের ছুটির পর তিনি ঐ বাসার উক্ত ছাত্রগণের নিকট বেড়াইতে যাইতেন এবং সন্ধ্যা পর্যান্ত সেখানে থাকিয়া সাহিত্য-দর্পণ দেখিতেন। এক দিবস সুপ্রসিদ্ধ দর্শন-শাস্ত্র-বেত্তা জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় "ল" কমিটির পরীক্ষা দিয়া জজ পণ্ডিতের কর্ম্ম লইবার মানসে তারানাথ তর্কবাচস্পতির সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি তথায় ঈশ্বর চন্দ্রকে সাহিত্যদর্পণ আবৃত্তি করিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "এত অল্প-বয়স্ক বালক সাহিত্য-দর্পণের কি বুঝিবে?" তর্কবাচস্পতি মহাশয় তদুত্তরে বলিলেন, "বালক কিরূপ শিখিয়াছে,

একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন না।” তর্কপঞ্চানন মহাশয় বালকের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন বালক এক অসাধারণ পণ্ডিত! আকারে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু বিদ্যা বিষয়ে, জ্ঞানের বিস্তৃতিতে প্রাচীন বট বৃক্ষের ন্যায় বহু দূর অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তিনি প্রীতি-পূর্ণ হইয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে বলিলেন, “এ বালক কালে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে অদ্বিতীয় লোক হইবে। এত অল্প বয়সে সংস্কৃত ভাষায় এরূপ ব্যুৎপন্ন লোক আমার দৃষ্টি গোচর হয় নাই। ইহা শুনিয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয় বলিলেন, “আমরা এই বালককে কালেজের মহামূল্য অলঙ্কার স্বরূপ মনে করি।” জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় তদবধি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ঈশ্বরচন্দ্রের এতাদৃশ গুণ-পনার বিশেষ প্রশংসা করিতেন।

এই সময়ের নিয়মানুসারে বালকগণকে অগ্রে অল-ঙ্কার, ন্যায় ও বেদান্ত এবং তৎপরে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইত। স্মৃতি শাস্ত্রের পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, ছাত্রেরা জজ পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হই-তেন। ঈশ্বরচন্দ্র অলঙ্কার শ্রেণীতে পাঠ করিতে করিতেই কালেজের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নের অনুমতি গ্রহণ করিলেন। বিদ্যালয়ের সকল পাঠ শেষ করিয়া ছাত্রেরা ‘ল’ কমিটীর পরীক্ষা দিবার জন্য স্মৃতির শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতেন এবং

সকল বালককেই দুই তিন বৎসর কাল কঠোর পরিশ্রম সহকারে মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে হইত। তৎপরে পরীক্ষা দিয়া কেহ বা উত্তীর্ণ হইতেন, কেহ বা বিফলমনোরথ হইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিতেন, কিন্তু বালক ঈশ্বরচন্দ্র অনন্যকর্ম্মা হইয়া, দিবারাত্রি শ্রম করিয়া, ছয় মাসের মধ্যে সেই সুকঠিন ও দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থ সকল আয়ত্ত করিয়া কমিটির পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এক দিকে নিজের মেধা ও বুদ্ধিমত্তার অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্যদিকে বঙ্গীয় বালকগণের সমক্ষে শ্রমশীলতা, একাগ্রতা, এবং বিদ্যাশিক্ষায় অনুরাগ প্রদর্শনের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

কিশোরবয়স্ক অজাতশ্মশ্রু বালক ঈশ্বরচন্দ্র 'ল' কমিটীর পরীক্ষায় দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং ছয় মাসের মধ্যে সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়াছেন শুনিয়া সকলেই একবারে বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইল। এ ঘটনাটী এতই বিস্ময়কর হইয়াছিল যে সহজে কেহ বিশ্বাস করিতে পারে নাই। যখন ঈশ্বরচন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমাণপ্রদ সার্টিফিকেট পাইলেন, তখন সকলের সংশয় দূর হইল। 'ল' কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার অল্প দিন পরে ত্রিপুরার জজ পণ্ডিতের পদশূন্য হয়। সপ্তদশবর্ষীয় বালক ঈশ্বরচন্দ্র এই পদ পাইবার মানসে

আবেদন করেন, তদুত্তরে উক্ত পদ গ্রহণের জন্য তাঁহার নিয়োগ পত্র আসিল। কিন্তু পিতার অসম্মতি নিবন্ধন তিনি উক্ত কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

অন্যান্য পরীক্ষা শেষ করিয়া ঊনবিংশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্তের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। উক্ত শ্রেণীর অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মাহশয়ও বালক ঈশ্বরচন্দ্রের গুণপনায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যে সকল বিষয়ে অধ্যাপক মহাশয়ের সন্দেহ হইত বা পাঠের যে সকল স্থল অসংলগ্ন বোধ হইত, সে সকল বিষয়ে শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত তর্কবিতর্ক করিতেন। অনেক সময়ে এরূপ আলোচনায় প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া বাচস্পতি মহাশয় বালকের উপর সন্তুষ্ট হইয়া বলিতেন,—"তুমি ঈশ্বর।"

এই সময়ের নিয়মানুসারে স্মৃতি, ন্যায় ও বেদান্ত শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষার সময় সংস্কৃত পদ্য ও গদ্য রচনা করিতে হইত। সর্ব্বোৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য রচনার প্রত্যেক বিষয়ে এক শত টাকার পুরস্কার ছিল। যে বিষয়ে যাঁহার রচনা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইত, তিনি উক্ত পুরস্কার পাইতেন। উভয় পরীক্ষা একদিনে হইত। দশটা হইতে একটা পর্য্যন্ত গদ্য রচনার এবং একটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত কবিতা রচনার সময় নির্দ্ধারিত ছিল। পরীক্ষার্থী বালকেরা সমাগত হইয়াছে, পরীক্ষা আরম্ভ

হইবে, এমন সময় অলঙ্কার শ্রেণীর অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে অনুপস্থিত দেখিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে অন্যত্র অপেক্ষা করিতে দেখিয়া তিনি তাহাকে ধরিয়া আনিলেন এবং অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবকে বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে তথায় বলপূর্ব্বক বসাইয়া দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র রচনা বিষয়ে নিজের অনুপযুক্ততার কথা উল্লেখ করিয়া অব্যাহতি পাইবার জন্য বার বার মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তর্কবাগীশ মহাশয় তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "যা পার লিখ, নচেৎ অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব রাগ করিবেন।" ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন—"কি লিখিব ?" শিক্ষক বলিলেন, "সত্যং হি নাম, আরম্ভ করিয়া লিখ"। সেবার "সত্য কথনের মহিমা" গদ্য রচনার বিষয় নির্দ্দিষ্ট ছিল। শিক্ষকের আদেশ ও উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বলা বাহুল্য পরীক্ষকগণের বিবেচনায় তাঁহার প্রবন্ধই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়ায় তিনি একশত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর পদ্য রচনা বিষয়েও তাঁহার প্রবন্ধ উৎকৃষ্টতর বিবেচিত হওয়াতে তিনি আর একটী পুরস্কারও প্রাপ্ত হইলেন।

তিনি ইহার পর বেদান্তের পরীক্ষা দিয়া ন্যায় ও দর্শনের শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন। এই শ্রেণীতে এক

বৎসর কাল অধ্যয়নের পব পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওযাতে একশত টাকা পুবস্কার পাইলেন এবং সেবারের পদ্য-বচনায তাঁহার কবিতাগুলি অপব সকলেব অপেক্ষা উত্তম বিবেচিত হওযাতে তিনি আবও একশত টাকা পুবস্কাব প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে ঠাকুবদাস বন্দ্যোপাধ্যায তাঁহার মধ্যম পুত্র দীনবন্ধুব বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করেন। এই উপলক্ষে ঠাকুবদাস ব্যয-বাহুল্য-নিবন্ধন কিছু ঋণ-গ্রস্ত হইযা পড়েন। বীবসিংহেব বাটীতে ব্যয়-সঙ্কোচ কবিতে বিধিমতে চেষ্টা কবিযা কোন ফল দর্শিল না। সুতবাং কলিকাতায অল্প ব্যযে বাসা খবচ চালাইতে লাগিলেন এবং উদ্বৃত্ত অর্থে ঋণ পবিশোধ কবিতে লাগিলেন। ঈশ্ববচন্দ্রের পবীক্ষাব ফল ভাল হওয়াতে যে দুই শত টাকা পুবস্কাব পাইযাছিলেন, তদ্দাবা ঋণ পরিশোধের পক্ষে যথেষ্ট আনুকূল্য হইয়াছিল।

এই সময়ে কলিকাতাব বাসায সকলকেই আহাবাদি বিষয়ে যৎপবোনাস্তি ক্লেশ ভোগ কবিতে হইয়াছিল। দুগ্ধ, মৎস্য ও উৎকৃষ্ট তবকাবী প্রভৃতি কিছু কালের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। বৈকালে জলখাবারের জন্য আধ পয়সার ছোলা ভিজান থাকিত, আধ পযসাব বাতাসা আনিয়া সকলে মিলিয়া ঐ ছোলা আর বাতাসায় বৈকালের জলযোগের কার্য্য সমাধা করিতেন। আশ্চর্য্যের

বিষয় এই যে, ঐ ছোলার কিযদংশ রাত্রিতে কুমড়ার তবকাবীতে দেওয়া হইত। প্রাতঃসন্ধ্যা কুমড়াব তরকারী আর ভাতে উদব পূর্ণ কবিযা, বাসায পাচক ও দাসদাসীর সমস্ত কাজ একাকী সমাপন করিযা, বিদ্যালয়ের সমগ্র পাঠ সুন্দবরূপে প্রস্তুত কবাতেই যে কেবল তাঁহার শ্রমশীলতা, অধ্যবসায, সহিষ্ণুতা ও আগ্রহেব পরিচয় প্রাপ্ত হওযা যায়, তাহা নহে, অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দিবাবাত্রি এইরূপ ক্লেশকব শারীরিক ও মানসিক পবিশ্রম কবিযাও তিনি সর্ব্বদা প্রসন্ন-মনে কালাতিপাত করিতেন, কেহ কখন তাঁহাকে এই সকল বহু পবিশ্রমেব কার্য্য সম্পাদনেব জন্য দুঃখ প্রকাশ কবিতে কিংবা এ সকল কার্য্য সম্পাদনে অনিচ্ছা প্রকাশ কবিতে শুনেন নাই। তিনি সর্ব্বদা প্রসন্নভাব পরিচাযক হাস্যপূর্ণ মুখে সকলেব সহিত কথা কহিতেন।

তিনি যে এরূপ দুঃসহ দুঃখেব অবস্থায পড়িযা মনের সুখে কালাতিপাত কবিতেন, তাহাব বিশেষ প্রমাণ এই যে, সেবার পূজার সমযে যখন বাটী গিযাছিলেন, তখনও অন্যান্য বাবেব ন্যায় নিজেব ছোট ছোট সহোদর ও পাড়ার বালকবৃন্দকে লইযা পূর্ব্ববৎ খেলা কবিতে লাগিলেন। গ্রামের অন্নক্লিষ্ট ও পীড়িত লোকদের সাহায্যার্থে যথাসাধ্য অর্থ ব্যয করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। প্রতিবেশিগণের মধ্যে যাহারা বস্ত্রাভাবে, জীর্ণ ও ছিন্ন

বস্ত্রখণ্ডে অতি কষ্টে লজ্জা নিবারণ করিতেছিল, তাহাদিগের কাহাকেও দেখিবামাত্র, গামোচা পরিধান পূর্ব্বক নিজের পরিধেয় দান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, নিজের দুঃখ কষ্টের চিন্তায় কিংবা ঘোরতর অভাবের অবস্থায় তাঁহার চিত্ত-বিপর্য্যয় ঘটিত না। তিনি প্রসন্নমনে সর্ব্ববিধ ক্লেশই সহ্য করিতে পারিতেন। এই সম্বন্ধে আর একটী ঘটনা এই স্থানেই উল্লেখযোগ্য এবং তাহাতে তাঁহার মনের দৃঢ়তা ও নির্ব্বিকার ভাবের অতি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে এক্ষণকার মত কলিকাতায় মিউনিসিপালিটীর শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। তখন সহরের চারিদিকই দুর্গন্ধপূর্ণ ছিল। পুষ্করিণী ও ডোবা সকল পচা ময়লা জলে পূর্ণ থাকিত; ইহাদের এক একটাকে এক একটা নরককুণ্ড বলিলেই ঠিক পরিচয় দেওয়া হয়। রাজপথের উভয় পার্শ্বের অনাবৃত জল-প্রণালীগুলি দিবারাত্রি নরককুণ্ডের আকার ধারণ করিয়া থাকিত। শতকরা নিরানব্বইখানি বাটীতে মলমূত্র ও কৃমিপূর্ণ পূতিগন্ধময় এক একটা নরককুণ্ড প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখনকার কলিকাতা আর এখনকার কলিকাতায় কত প্রভেদ, যাঁহারা সে দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন, তাঁহারা বহু বর্ণনায়ও তাহার বিন্দুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা

যে গৃহে থাকিতেন, সে গৃহেও এইরূপ নরককুণ্ডের অভাব ছিল না। যে ক্ষুদ্র গৃহে ঈশ্বরচন্দ্র দুই বেলা পাক করিতেন, তাহা এইরূপ নরককুণ্ডের অতি সন্নিকটে সংস্থাপিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের মুখে শুনিয়াছি, তিনি যখন আহার করিতে বসিতেন, তখন কৃমি সকল দলে দলে তাঁহার ভোজন পাত্র আক্রমণ করিতে আসিত। ইহাদিগের গতিরোধ করিবার জন্য তিনি আহারের সময়ে প্রতিদিনই এক এক ঘটী জল লইয়া বসিতেন। সেই সকল কৃমি নিকটস্থ হইলেই ঘটী হইতে জল ঢালিয়া দিতেন, আর তাহারা সেই প্রক্ষিপ্ত জল-স্রোতের সহিত দূরে গিয়া পড়িত। দুর্গন্ধের ত কথাই ছিল না। যে ন্যক্কারজনক গরল কণা নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে লোকে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠে, তিনি সেই পরিমল-পয়োধি মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নীরবে ভোজন পাত্র শূন্য করিতেন। এইরূপ বিবিধ বিড়ম্বনাগ্রস্ত হইয়াও শত্রু-সমাকুল স্থানে তিনি নিশ্চিন্ত-চিত্তে উপবেশন পূর্ব্বক রন্ধনাদি কার্য্য সমাপন করিয়া, অপর সকলকে আহার করাইয়া, পরিশেষে নিজের জঠরানল নির্ব্বাণ করিতেন।

এই সংস্রবে আর একটী বিশেষ ঘটনা এই স্থানে উল্লেখ-যোগ্য। এই পাকশালাটী গৃহের এমন স্থানে স্থাপিত ছিল যে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের একটী কিরণও কোন দিন

ভ্রম ক্রমেও গৃহের সে অঞ্চলে উঁকি মারিত না। সুতরাং ঘন অন্ধকাব নীববে নির্ব্বিবাদে তথায় বাজত্ব কবিত। অনেক সময়ে দিনেব বেলায তথায প্রদীপ জ্বালিযা পাককার্য্য সমাপন কবিতে হইত। এ জন্য সে কুটীবে আবসুলাকুল পবম সুখে বাস কবিত। কেবল বাস কবিত তাহা নহে, সময়ে সময়ে দৌবাত্ম্যও কবিত। সুযোগ মত যাহা কিছু পাইত তাহাই ভক্ষণ করিত। কখন কখন অন্ন ব্যঞ্জনে পডিত। এজন্য সর্ব্বদাই তাঁহাকে খুব সাবধানে বন্ধন ও ভোজন কার্য্য সমাপন কবিতে হইত। এক দিবস একটু অসাবধান হওযাতে ভোজনেব সময়ে তবকাবীৰ মধ্যে একটা আবসুলা দেখিতে পাইলেন। তখন সে কথা প্রকাশ কবিলে কিংবা ভোজন পাত্রেব নিকট সে পোকা ফেলিয়া বাখিলে, পাছে ঘৃণা-প্রযুক্ত অপব সকলেব আহা-বেব ব্যাঘাত জন্মে, এই আশঙ্কায নিরুপায হইযা ব্যঞ্জন সহ সেই আবসুলাটীকে মুখ-গহ্বরে নিক্ষেপ কবিলেন এবং অন্যান্য খাদ্যেব সহিত তাহাকে উদরস্থ করিযা উপস্থিত বিপদ হইতে অপব সকলকে বক্ষা কবিলেন। সকলেব ভোজনেব পব যখন আবসুলা খাওযাব ব্যাপাব প্রকাশ কবিলেন, তখন সকলে তাঁহাব এইরূপ বিস্ময়কব আচরণে স্তম্ভিত হইয়া বহিলেন। আমবা তাঁহার সে সময়েব উপস্থিত বুদ্ধি ও কার্য্যেব দৃঢ়তা স্মরণ কবিয়া অবাক্ হইতেছি। তিনি এত অল্প বয়সে এতদূর

আত্মশাসনে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই উত্তরকালে যাহা ধরিয়াছেন তাহাই সম্পন্ন করিতে, এবং তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র দেখিতে গৌরবর্ণ পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু তাহার কি এক আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি ছিল যে, যিনি একবার তাঁহাকে দেখিতেন, একবার তাহার সহিত আলাপ করিতেন, যিনি কয়েকদিন তাঁহার সহিত বাস করিতেন, তিনি আর তাঁহাতে (ঈশ্বরচন্দ্রে) আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। সে সময়ে সংস্কৃত কলেজে যাঁহারা অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই তাঁহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন ও তাঁহার কল্যাণ কামনা করিতেন। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, সুপ্রসিদ্ধ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরনাথ তর্কভূষণ, শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, সুবিখ্যাত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ এক বাক্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার সমসাময়িক ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ছাত্রমণ্ডলী তাঁহাকে অসাধারণ ক্ষমতাশালী ছাত্র জানিয়া সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। এতদ্ব্যতীত যখনই যে কোন সম্ভ্রান্ত লোক কিংবা কোন অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য তাঁহার সহিত পরিচিত হইতেন, তিনিই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া দুশ্ছেদ্য প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেন।

বেদান্ত শ্রেণীতে পাঠকালে অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় বয়সে প্রবীণ হইলেও ঈশ্বরচন্দ্রের গুণে মুগ্ধ হইয়া দিন দিন নিরতিশয় স্নেহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বয়সে প্রবীণ কেন, প্রায় স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিজের স্নান, আহার, আচমন ইত্যাদি কার্য্যে অন্য লোকের সহায়তার আবশ্যক হইত। স্নেহানুগত ও উপযুক্ত ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র পুত্র স্থানীয় হইয়া অনেক সময়ে বাচস্পতি মহাশয়ের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। এইজন্য তাঁহার প্রতি গুরুর পুত্রাধিক বাৎসল্যের সঞ্চার হইয়াছিল। সংসারের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় কার্য্যে উপযুক্ত সন্তানের সহিত পিতা যেরূপ পরামর্শ করিয়া থাকেন, বাচস্পতি মহাশয়ও ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত তদ্রূপ আচরণ করিতেন। তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া অধ্যাপক মহাশয় প্রায় কোন কাজই করিতেন না। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যখন এতাদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে, তখন বাচস্পতি মহাশয় পুনর্বায় দারপরিগ্রহের মানস করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, দেখ, সংসারে আমার কেহই নাই, বড় কষ্ট পাইতেছি, লোকে বলে এত কষ্ট ভোগ না করিয়া পুনর্বায় দারপরিগ্রহ করিলেই সকল অসুবিধার অবসান হয়, বিশেষতঃ অনেকগুলি বড়লোক এ কার্য্যে উদ্যোগী হইয়াছেন এবং একটী সুস্বভাবা, বয়স্থা ও

সুন্দরী পাত্রীও পাওয়া গিয়াছে। এখন তোমার মত হইলেই বাবা, আমি এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারি।

বৃদ্ধ শিক্ষকের এই অসঙ্গত ও ধর্ম্ম-বিগর্হিত সঙ্কল্পের স্বপক্ষে বলিবার কোনও কথা আছে কি না ঈশ্বরচন্দ্র মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গুরুর এই নির্ম্মম ও স্বার্থান্ধ প্রস্তাবের অনুকূলে কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাইলেন না। তখন ঈশ্বরচন্দ্র স্বাভাবিক স্বাধীন প্রকৃতির অনুযায়ী অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন আপনার এই বৃদ্ধ বয়সে আর নূতন সংসার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। আপনার আর অধিক দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। বিবাহ করিয়া একটী নিরপরাধা বালিকাকে চিরদুঃখিনী করিবেন না। বিবাহ দূরে থাকুক, বিবাহের চিন্তাতেও আপনাকে পাপ স্পর্শিবে। সর্প-দর্শনে প্রাণভয়ে ভীত ব্যক্তি যেমন দূরে পলায়ন করে, বাচস্পতি মহাশয়ও ঈশ্বরচন্দ্র হইতে সেইরূপ দূরে পলায়ন করিতে করিতে বলিলেন—"লাটু বাবুর চেয়ে উনি বেশী বুঝেন।" ঈশ্বরচন্দ্র নীরবে দণ্ডায়মান। গুরু পুনরপি অগ্রসর হইয়া তাঁহার হাত দুখানি ধরিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে নিজের অসুবিধার কথা বার বার বলিলেও, হিমালয় সদৃশ অটল বিদ্যাসাগর স্থিরচিত্তে ও শান্তভাবে পূর্ব্ব-

বং নিজের অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন, এবং বার বার বিনম্রভাবে অনুরোধ করিয়াও কোন ক্রমেই বাচস্পতি মহাশয়কে এরূপ অন্যায় অনুষ্ঠান হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। বাচস্পতি মহাশয় পরলোকগত রামদুলাল সরকারের বংশধর ছাতু বাবু ও লাটু বাবুদের সভা পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং ছাতুবাবু ও লাটু বাবু এবং নড়াইলের প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু রামরতন রায়ের উদ্যোগে বারাশত নিবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক পরম সুন্দরী বালিকা কন্যার সহিত বৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয়ের পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইল।

ঈশ্বরচন্দ্র এই ঘটনায় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তদবধি তিনি বাচস্পতি মহাশয়ের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্তও হইয়াছিলেন, কিন্তু গুরুর স্নেহাধিক্যনিবন্ধন একবারে সম্বন্ধচ্ছেদ হয় নাই। একদা বাচস্পতি মহাশয় তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন :—"ঈশ্বর, তোমার মাকে একদিনও দেখিতে গেলে না?" ঈশ্বরচন্দ্র এই কথা শুনিয়া অজস্রধারে অশ্রুপাত করিলেন। কোন উত্তর করিলেন না। পরে বাচস্পতি মহাশয় একদিন বলপূর্ব্বক ঈশ্বরচন্দ্রকে স্বকীয় গৃহে লইয়া গেলেন। যাইবার সময়ে তিনি সংস্কৃত কালেজের দ্বাররানের নিকট হইতে দুটী টাকা লইয়া গেলেন। উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বালিকার চরণপ্রান্তে টাকা দুটি রাখিয়া সত্বরপদে বাহির

বাটীতে আসিতেছিলেন, এমন সময়ে বাচস্পতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন "তোমার মাকে দেখিয়া যাও।" এই বলিয়া দাসীকে নববধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে বলিলেন। তখন বাচস্পতি মহাশয়ের নববিবাহিতা পত্নীকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সেই জননী স্থানীয়া বালিকাকে দর্শন করিয়া ও এই বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বাচস্পতি মহাশয় "অকল্যাণ করিস্ না রে" বলিয়া তাঁহাকে লইয়া বাহির বাটীতে আসিলেন এবং নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্রের মনের উত্তেজনা ও হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে ও তাহাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া, শেষে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জল খাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পাষাণতুল্য কঠিন প্রতিজ্ঞা পরায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র জলযোগ করিতে সম্পূর্ণরূপে অসম্মত হইয়া বলিলেন :— "এ ভিটায় আর কখনও জলস্পর্শ করিব না।" বলা বাহুল্য যে এই ঘটনার কিছুকাল পরে বাচস্পতি মহাশয় অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা পত্নীকে বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় কেমন কোমল ও কিরূপ পরদুঃখ কাতর ছিল, তাহা এই একটী ঘটনার দ্বারা সুন্দররূপে অনুভব করিতে পারা যায়। কে বলিতে পারে যে বৃদ্ধ

বাচস্পতি মহাশয়ের এই অনুষ্ঠান তাঁহার অন্তরে অবলা-কুলের কল্যাণ কামনার উদ্রেক করিয়া দেয় নাই? যে ব্যক্তি একটী বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন, সে সময়ের ঐপ্রকার শত শত অনুষ্ঠান যে তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তিনি যে ক্রমে ক্রমে অসহায়া অবলাগণের পরম বন্ধু হইয়া পড়িতেছিলেন, ইহাই তাঁহার মত হৃদয়বান লোকের পক্ষে স্বাভাবিক এবং আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র গঠনের পক্ষে এই ঘটনা এবং এইরূপ আরও অনেক ঘটনা বিশেষ ভাবে সহায়তা করিয়াছিল।

ন্যায় ও দর্শনের শ্রেণীতে যখন তিনি পাঠ করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে দুই মাসের জন্য ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের উপ-যুক্ততা স্মরণ করিয়া কালেজের অধ্যক্ষ তাঁহাকেই দুই মাসের জন্য সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তিনি মাসিক চল্লিশ টাকার হিসাবে দুই মাসে আশী টাকা পাইয়া পিতার হাতে দিয়া বলিলেন "এই অর্থ ব্যয়ে আপনি তীর্থপর্য্যটনে গমন করুন।" পুত্রের এতাদৃশ পিতৃভক্তি ও তীর্থপর্য্যটনে অনুরাগ দেখিয়া পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপরাপর সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পুত্রের অনুরোধমত পিতা ঐ

অর্থব্যয়ে পিতৃকৃত্য সম্পাদনার্থে গয়াধামে যাত্রা করিলেন।

পিতৃদেব তীর্থপর্য্যটনানন্তর জলপথে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র দর্শনশাস্ত্রের পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া একশত টাকা, সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা রচনার জন্য একশত টাকা, আইন পরীক্ষার পুরস্কার পঁচিশ টাকা এবং উৎকৃষ্ট হস্তাক্ষরের পুরস্কার আট টাকা, সর্ব্বশুদ্ধ মোট ২৩৩৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র এই টাকা পিতার হাতে দিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে বলিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র চারি বৎসরে দর্শনশাস্ত্রের শ্রেণীর শেষ পাঠ্য ষড়দর্শনের পরীক্ষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়া প্রতিপত্তি ভাজন হইয়াছিলেন। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলেন "এতাদৃশ মেধাবী ও অদ্ভুতকর্ম্মা ছাত্র আর কখন আমার নয়নগোচর হয় নাই। ইহাকে পড়াইবার জন্য দর্শনশাস্ত্রে আমার বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইত; পড়াইবার সময় বোধ হইত যেন ঈশ্বর কতকাল পূর্ব্বে ঐ সকল শাস্ত্র বিশিষ্টরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন।"

এক্ষণে পাঠক চিন্তা করিয়া দেখুন ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্ররূপে কিরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন! তাঁহার গুণপনা এবং তাঁহার বিদ্যানুশীলন শক্তির বিচিত্রতা দর্শন করিয়াই তাঁহার শিক্ষক অদ্বিতীয় দর্শন শাস্ত্রবেত্তা জয়-

নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় এরূপ মহামূল্য অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রথম হইতে শেষ পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র হইয়া পরিশেষে সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ হইতে এরূপ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত বিদ্যার সকল বিভাগেই সমানভাবে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়, কোন এক বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত হন নাই। কোন এক বিষয়ে বিশেষ ভাবে পারদর্শী হওয়ার অর্থ এই যে, অন্যান্য বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ। বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে এরূপ যুক্তি প্রযুজ্য হইতে পারে না। কারণ পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া, বর্ণনাতীত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া সকল বিষয়ে সমান অনুরাগ প্রদর্শন করিতে এবং প্রত্যেক বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হইতে পারা কেবল লোকবিরলগুণসম্পন্ন ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবিতে পারে। কেহ ব্যাকরণে, কেহ সাহিত্যে, কেহ ন্যায়ে, কেহ বা দর্শনশাস্ত্রে আর কেহ বা ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া নিজ নিজ অধীত বিদ্যায় গণনীয় ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু যিনি এই সকল বিষয়ে সমভাবে উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারেন, তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রকার মতামত দিবার পূর্ব্বে বিশিষ্টরূপে চিন্তা করা আবশ্যক। আমাদের

ধারণার সপক্ষে তদানীন্তন সংস্কৃত কালেজের শিক্ষক-মণ্ডলী সমবেত হইয়া সাক্ষ্য দিতেছেন। তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে যে প্রশংসা-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন এখানে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ঃ—

অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসা পত্রং দীয়তে। অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুত-কোম্পানি-সংস্থাপিত-বিদ্যামন্দিরে ১২ দ্বাদশবৎসরান্ ৫ পঞ্চমাসাংশ্চোপস্থায়াধো লিখিত-শাস্ত্রাণ্যধীতবান্।

ব্যাকরণম্	. .	শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মভিঃ
কাব্যশাস্ত্রম্	. .	শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মভিঃ
অলঙ্কারশাস্ত্রম্ ...		শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
বেদান্তশাস্ত্রম্	.	শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
ন্যায়শাস্ত্রম্		শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মভিঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রম্	...	শ্রীযোগধ্যান শর্ম্মভিঃ
ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ	... .	শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ

সুশীলতয়োপস্থিতৈস্তৈস্তৈরেতেষু শাস্ত্রেষু সমীচীনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট। ১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয়-সৌরমার্গশীর্ষস্য বিংশতিদিবসীয়ম্।

10 December, 1841. (Sd) RASOMOY DUTTA

Secretary.

সকল শ্রেণীর অধ্যাপক ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় অসাধারণ

ধীশক্তি সম্পন্ন বালকের শিক্ষকপদবাচ্য হইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধ্যাপিত বিদ্যায় সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত এবং ইঁহারা সকলে সমবেত হইয়া যে একবিংশ-বর্ষ-বয়স্ক যুবককে বিদ্যাসাগর উপাধি প্রদানপূর্ব্বক সাদরে বরণ করিয়াছেন, ইহার দ্বারা এইরূপ বুঝায় যে, প্রত্যেক বিষয়েই তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। সকল বিষয়েই তিনি সুগভীর সাগরসদৃশ অতলস্পর্শ ছিলেন। পর্ব্বত প্রমাণ বাধাবিঘ্নের সহিত বীরোচিত সংগ্রামসহকারে অধ্যয়নে এতাদৃশ অনুরাগ প্রদর্শন, দরিদ্রবঙ্গের প্রত্যেক ছাত্রের অনুকরণীয়। অদ্ভুতকর্ম্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় নিষ্ঠাসহকারে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী হইয়া ছাত্রজীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রজীবন কঠোরতা, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও ত্যাগস্বীকারের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। এতাদৃশ গুণবান বালক যে গৃহে লালিত পালিত হইয়াছিলেন, সে গৃহের প্রত্যেকেরই মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, যে দেশীয় বালকমণ্ডলী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্রজীবনের আদর্শ লাভ করিয়াছে, সে দেশের সৌভাগ্যের সীমা নাই। যে বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সে বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব সফল হইয়াছে। বীরসিংহের কালীকান্ত গুরুমহাশয় হইতে মহামহোপাধ্যায় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় পর্য্যন্ত

সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষাগুরু বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা ছাত্রজীবনের উচ্চতম শ্লাঘার বিষয় আর কি হইতে পারে?

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে যখন ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কালেজে প্রবেশ করেন, তখনও ইংরাজী শিক্ষার সুপ্রচার সাধিত হয় নাই। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক সমবেত হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালীর অনুকরণে এ দেশীয় বালকগণকে শিক্ষা দিবার সূচনা করিতেছিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০ শে জানুয়ারী সোমবার গরাণহাট্টায় গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে প্রাতঃস্মরণীয় হেয়ার, হ্যারিংটন্ ও স্যর হাইড ইষ্ট প্রভৃতি সহৃদয় ইংরাজমণ্ডলী ও বহু সংখ্যক দেশীয় ভদ্রলোকের উৎসাহ ও আগ্রহে হিন্দু কালেজের সর্ব্বপ্রথম সূত্রপাত হইলেও তাহার স্থায়িত্ব ও শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ছিল; কারণ তখনও গভর্ণমেণ্ট ইহার উন্নতি কল্পে কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। এক সময়ে অর্থাভাবে হিন্দু কালেজ যখন অতীতের স্মৃতিমাত্রে পরিণত হইতে যাইতেছিল, অথচ অপর পক্ষে গভর্ণমেণ্ট কেবল সংস্কৃত কালেজের প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষা বিষয়ে আপনাদের কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি সাধনে উদ্যত হন, তখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের আবেদনে ও ডাক্তার

হোরেস হেম্যান উইল্‌সনের চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিষয়ে নূতন ভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহামতি হেয়ার বঙ্গভূমির পশ্চাতে থাকিয়া বিবিধ উপায়ে সহায়তা করিতেছিলেন। এমন কি, তাঁহার প্রাণগত চেষ্টা ও উদ্যম না থাকিলে, বর্ত্তমান শিক্ষার স্রোতঃ বহুদূর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ১,২৪০০০ টাকা ব্যয়ে, হেয়ার-প্রদত্ত ভূমি খণ্ডের উপরে সংস্কৃত ও হিন্দুকালেজের বাটীর নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান সংস্কৃত কালেজ ও হিন্দু স্কুলের বাটী নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে পর, ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয়বিধ বিদ্যালয়ই ঐ বাটীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু তখনও অর্থাভাবে হিন্দু কালেজ সময়ে সময়ে নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া পড়িতেছিল। পরিশেষে নিরুপায় হইয়া কালেজের অভিভাবকগণ গভর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবেদন প্রেরণ করিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধীয় নীতির উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া, কেবল গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত অর্থের সদ্ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহাদের দৃষ্টি রাখিবার অধিকার দিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সাহায্য লওয়া স্থির হইল। সুতরাং এই সময় হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজী শিক্ষার সুপ্রচার আরম্ভ হইল বলা যাইতে পারে।

দ্বিপ্রহরা রজনীর ঘোর অন্ধকারে সুষুপ্তির সুমিষ্ট ক্রোড়ে শায়িত লোক মণ্ডলী সহসা বন্যার জলে ভাসিলে

যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইংরাজী শিক্ষার প্রথম বন্যা-প্রবাহেও ঠিক তদনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। নূতন ভাব ও নূতন চিন্তার স্রোতঃ বিদ্যুতের ন্যায় তীব্র তেজে চারিদিক চমকিত করিয়া ছুটিল, নবালোকে নব্য সম্প্রদায় দিশাহারা হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। যুবক ফিরিঙ্গী-শিক্ষক ডিরোজিও এই নব্য বঙ্গের দীক্ষা-গুরু। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাম-গোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ সিক্‌দার, মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক প্রভৃতি সে সময়ের যুবকমণ্ডলী চিন্তা ও ভাব বিষয়ে বর্ত্তমান বঙ্গের পিতৃস্থানীয়। ডিরোজিওর সহৃদয়তা, বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের মধুর আকর্ষণে বহু সংখ্যক যুবক সমবেত হইয়া, একাডেমি নামক সভায়, ধর্ম্ম, সমাজতত্ত্ব ও অন্য নানাবিধ আলোচনায় আপনাদিগকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ডেভিড হেয়ার সর্ব্বদা ঐ সকল আলোচনায় যোগ দিতেন। সময়ে সময়ে গভর্ণর জেনারেল বেণ্টিঙ্ক মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ণেল বেনসনও সভায় উপস্থিত হইয়া উপদেশ ও উৎসাহ দানে সভ্যদিগকে অনুগৃহীত করিতেন। সে সময়ের প্রবীণ সামাজিক গণের ভয় ও ভাবনাজনিত উৎপীড়নে এই নূতন চিন্তা-স্রোতঃ ভীষণ তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে চারি-

দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনেকে ইহার গতি বোধ করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তাঁহারা তদ্দ্বারা তাঁহাদের আশার বিপরীত ফল দর্শনে ভীত হইয়া ক্রমে নীরব হইলেন।

সর্ব্ব প্রথমে যাঁহারা এই নূতন শিক্ষার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িক। তিনি যখন বিদ্যালয়ে, তাঁহারাও তখন বিদ্যালয়ে। তিনি সংস্কৃত কালেজে, উপরোক্ত মহোদয়গণ হিন্দু কালেজে লেখা পড়া শিখিতে ছিলেন। সংস্কৃত কালেজ ও হিন্দুকালেজ একই গৃহে অবস্থিত ছিল। সুতরাং ইহাঁদের অনেকের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে সখ্যতা জন্মিবে, ইহাই স্বাভাবিক। রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি অনেকের সহিত তাঁহার বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে বাঙ্গালী ছাত্রমণ্ডলীর পরম সুহৃদ ডেভিড হেয়ার লোকান্তরিত হন। তাঁহার বিয়োগে সমগ্র কলিকাতাবাসী লোকমণ্ডলী শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার স্মরণার্থে যত প্রকার আয়োজন হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রতিবৎসর তাঁহার মৃত্যুর দিনে

শিক্ষিত মণ্ডলীর একটী সভা, একাল পর্য্যন্ত আহূত হইয়া আসিতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বন্ধুবান্ধব-পরিবেষ্টিত হইয়া অনেক সময়ে এই সভায় উপস্থিত থাকিতেন।

বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইবার সময়ে, উৎকৃষ্ট ইংরাজী ভাষা তাঁহার সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত না হইলেও তিনি বহুল পরিমাণে ইংরাজী ভাব ও চিন্তার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, একথা বলা যাইতে পারে এবং নিজেও ইংরাজী শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া বিদ্যালয় ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন। একদিকে অন্ধ বিশ্বাসের অধীন হইয়া আপনার ভাগ্যের নিন্দা করিতে করিতে লোকে অলসভাবে দিনযাপন করিতেছিল, আর একদিকে নূতন ভাব ও নূতন উদ্যমের খরতর স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া সে সময়ের বঙ্গীয় যুবক মণ্ডলীকে কোথায় কোন অজ্ঞাত পথে লইয়া চলিয়াছিল। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া নব্য বিদ্যাসাগর দিব্য-নেত্রে তাঁহার ভাবী সঙ্কল্পের পথ দেখিতে পাইলেন, তাঁহার মানস-নেত্রে তাঁহাকে বহুবিধ বাধা বিঘ্নের মধ্যে সর্ব্বদা সুপথ দেখাইয়া দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিল, তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের সংমিশ্রণে তাঁহার নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া লই-লেন। তিনি প্রাচ্য কুসংস্কার ও পাশ্চাত্য আডম্বর পরিহার পূর্ব্বক নিষ্ঠাবান ও কর্ত্তব্য পরায়ণ বীরপুরুষের

উপযোগী পথে দিন দিন অগ্রসব হইতে লাগিলেন। ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষাব সংযোগে যে কি মহামূল্য সম্পদেব অধিকাবী হইতে পাবা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি উভয শিক্ষাব মন্দভাগ বর্জ্জন পূর্ব্বক, বত্নোত্তোলন দ্বারা তাঁহাব জীবনেব শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিযা আমাদেব সম্মুখে বর্ত্তমান সময়ের জীবন-সমস্যাব মীমাংসা কবিযা গিয়াছেন।



পঞ্চম অধ্যায়।

সম্পন্ন লোকের উপবন ও লতা-মণ্ডপে ভৃত্যের জল-সেচনে ও পরিচর্য্যায় প্রস্ফুটিত পুষ্পবৃক্ষ সকলের ন্যায় তিনি বহু সমাদরে লালিত পালিত হন নাই। অযত্ন সম্ভূত বন কুসুম যেমন আপনি উঠে, আপনি ফুটে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তদ্রূপ বীরসিংহের গ্রাম্য-গৃহে দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। দরিদ্র পিতা ঠাকুরদাস কিরূপ ক্লেশে তাহাকে লালন পালন ও শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়, সে দুঃখকাহিনী শ্রবণে অশ্রু সংবরণ অসম্ভব। অপরিচিত দরিদ্র বালক যৌবনে পদার্পণ করিয়া, সংসারে প্রবেশ করিয়া, সুখ সম্ভোগ ও মান সম্ভ্রমের অধিকারী হইয়া প্রায়ই "ধরাকে শরা জ্ঞান" করে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে এরূপ অঘটন কখনও ঘটে নাই। তিনি বহুবিদ্যার আধার হইয়া, প্রভূত জ্ঞানের

অধিকারী হইয়া, প্রচুর ধন, সম্পদ ও সম্মানের অধীশ্বর হইয়া, একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই যে, তিনি বীরসিংহবাসী দরিদ্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। পর্ণকুটীরে শৈশবকাল কাটাইয়াছিলেন, এটী সর্ব্বদাই স্মরণ করিতেন। একাহার ও অনাহারে ছাত্রজীবন যাপন করিতে হইয়াছিল এ কথার উল্লেখে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। অথচ তাঁহার সময়ে তাঁহার অপেক্ষা সম্ভ্রান্ত লোক অতি অল্পই ছিলেন।

আমরা আজ যে বাঙ্গালা ভাষা পাঠ করি এবং যাহার অল্লাধিক আলোচনায় তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকি, ইহার জন্য আমরা তাঁহারই নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তিনি এবং তাঁহার সহযোগী ৺অক্ষয়কুমার দত্ত বর্ত্তমান বাঙ্গালাভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা। উভয়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে বাঙ্গালা সাহিত্য বঞ্চিত হইলে, ইহার এরূপ ত্বরিতপদে উন্নতিপথে অগ্রসর হওয়া বহুবিলম্বসাধ্য হইয়া পড়িত। সাহিত্য সেবাতেও তাঁহার কার্য্যগত মৌলিকতার প্রচুর প্রমাণ আছে। একদিন কয়েক ঘণ্টার পরিশ্রমের ফলে উপক্রমণিকা রচিত হইয়াছিল। উপক্রমণিকায় তাঁহার শ্রেষ্ঠতার বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। বেতাল, শকুন্তলা ও সীতার বনবাস যে লেখনীর গৌরবসাধন করিয়াছে, সেই লেখনীর বিশেষত্ব এই যে, তাহাই সুকু-

মারমতি শিশুগণের পাঠোপযোগী সরল গ্রন্থ সকলের জনয়িত্রী। আবার সেই লেখনী হইতেই বর্ণমালা ও সহজ শব্দবিন্যাসের পরিচয়-স্থল বর্ণপরিচয়েরও সৃষ্টি হইয়াছে; তাহাও আবার বিদ্যালয়-পরিদর্শন উপলক্ষে পথে পাল্কীতে যাইতে যাইতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিরচিত হইয়াছিল। কোমল কাঠিন্যের সমাবেশই তদীয় সাহিত্যবিষয়ক বিশেষত্বের পরিচয় স্থল।

তিনি বাল্যকাল হইতে পরসেবায় রত হইয়া যৌবনের প্রারম্ভে যখন সম্ভ্রমের উচ্চশিখরে উপবিষ্ট, তখন হইতেই তিনি গুণবানের গুণের আদর এবং দুঃখীর দুঃখহরণ ও সুখসাধন করিতে সদা ব্যস্ত; তাঁহার সে সময়ের সর্ব্বোচ্চ অধিকার মানব-সেবায় নিয়োগ করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রেমপূর্ণ সেবার ভাব লইয়া তিনি জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপনের সূত্রপাত করেন। যে ভুবনবিজয়ী কার্য্যকলাপের ভারে সমগ্র ভারতবাসী তাঁহার সমক্ষে নতমস্তক, যে সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে তিনি সৎসাহস, সত্যনিষ্ঠা ও মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিচয়দানে অক্ষয় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাহারও ক্ষুদ্র অঙ্কুরটী তদীয় কিশোরবয়স্ক ছাত্রজীবনে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। বালক ঈশ্বরচন্দ্র, বালিকা আত্মীয়াদিগের বৈধব্য ও তন্নিবন্ধন বিবিধ দুঃখ কষ্টের চিত্র দর্শনে ক্রমে নারী-সুহৃদরূপে

গঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৈশাখের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড যখন চারিদিক দগ্ধ করিত, বালিকা-বিধবা আত্মীয়াগণের শুষ্ককণ্ঠে ভূমিশয্যায় ইতস্ততঃ অঙ্গসঞ্চালন দর্শনে বালক ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "যদি কখন সুযোগ হয়, তবে রমণীকুলের এ দুঃখ দুর্দ্দশা নিবারণের চেষ্টা করিব।"

তাঁহার অধ্যাপক স্থবিরত্বপ্রাপ্ত বৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয়ের বালিকা স্ত্রীকে দেখিয়া, তিনি দারুণ মনস্তাপে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। যিনি একটী মাত্র বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন, সে সময়ের ঐ প্রকার শত শত অনুষ্ঠান যে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল এবং তিনি যে ক্রমে ক্রমে অসহায় অবলাগণের পরমবন্ধু হইয়া পড়িতেছিলেন, ইহাই তাঁহার মত হৃদয়বান লোকের পক্ষে স্বাভাবিক ও সঙ্গত। আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের নির্ম্মাণ পক্ষে এই ঘটনা এবং এইরূপ অসংখ্য ঘটনা বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল।

দরিদ্রের গৃহে নানাপ্রকার অভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, জনসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হওয়া এবং চিরদিন দীনজনের সুহৃদ্‌রূপে জীবন যাপন করিয়া যাওয়া, পুরুষশক্তিবিশিষ্ট মহাত্মা লোকের কার্য্য। তিনি বিদ্যালয়ে আদর্শ বালকরূপে, কর্ম্মস্থানে নিষ্ঠাবান্

ও কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারীর আদর্শরূপে, বাঙ্গালা সাহিত্যে সরল, মার্জ্জিত ও শ্রুতিমধুর গদ্য রচনার পথপ্রদর্শকরূপে আমাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান। সুহৃৎসেবায় তাঁহার তুলনা মিলে না। অপর দিকে আত্মীযতার ঋণ তিনি চিরদিন কৃতজ্ঞতাসহকারে স্মরণ করিতেন এবং বন্ধুগণের লোকান্তর গমনের পর তদীয় নাবালক পুত্রগণের কল্যাণ সাধনের জন্য সর্ব্বপ্রকার অসুবিধাই সহ্য করিতেন। সমাজ সংস্কারক্ষেত্রে আজ তাঁহার স্থান অধিকার করিবার নাই। তিনি যে বীরবেশে অবতীর্ণ হইয়া জাতীয় নর আবর্জ্জনা রাশি নির্ব্বাচন, উত্তোলন ও দূরে নিক্ষেপ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহার সে কার্য্যকলাপের উপযুক্ত সমাদর আমাদের নিকট হইতেছে না। আমরা সময় ও অবস্থার নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার মুক্তশক্তি, মুক্তভাব ও অতিমানুষ ঔদার্য্যের সমাদর কিরূপে করিব? তিনিই তাঁহার কার্য্যকলাপের তুলনাস্থল। তাঁহার অন্য তুলনা মিলে না। সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনে তিনি জনসমাজসমক্ষে প্রকৃত আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপরিমেয়তা, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি এবং জটিল সামাজিক প্রশ্নবিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং তাঁহার কার্য্যকৌশল কিরূপ বিচিত্রতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় স্থল, তাহা চিরদিনই ভাবী বংশের গবেষণার বিষয় ও চিরগৌরবস্থল

হইয়া থাকিবে এবং কালক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদীয় চরিত-মাধুরী আরও সমুজ্জ্বল আকার ধারণ করিবে।

মানব-প্রেম তিনি যেমন অনুভব করিয়াছিলেন, মানুষকে তিনি যেমন অকৃত্রিম স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, সেরূপ স্নেহের রসাঞ্জনে সুরঞ্জিত মধুমিষ্ট দৃষ্টিতে মানুষকে অতি অল্প লোকই দেখিতে শিখে। তিনি যে প্রাণ দিয়া পরোপকার সাধন করিতে সত্যসত্যই সক্ষম ছিলেন, তাঁহার পরিণত বয়সের শতপ্রকার ঘটনাদ্বারা তাহা ... করা হইয়াছে ; কিন্তু মানবপ্রেমের ধারা কিরূপে সর্ব... তাঁহার শৈশব নিষ্ঠুরতার দুরতিক্রমণীয় প্রাচীর উল্ল... করিয়া জল-প্রপাতের আকার ধারণ করে এবং প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, আমরা কেবল তাহার গোপন তত্ত্ব টুকুর উল্লেখ করিব মাত্র। দ্বাদশবর্ষীয় বালক বিদ্যা-সাগর নিজে নানা প্রকার দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকিয়াও বৃত্তির টাকায় পরসেবার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে যে বালক এরূপ পরদুঃখকাতর ও প্রতিজ্ঞা-পরায়ণ, আত্ম সুখাপেক্ষা যে বালক পরসুখে পরিতৃপ্ত, তিনি যে উত্তরকালে সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ, পরসুখ-সাধন-প্রিয় ও পরসেবাপরায়ণ মহাপুরুষে পরিণত হইবেন, ইহাই বিধাতার ব্যবস্থা।

পরোপকারে তাঁহার স্বজাতি ও ভিন্নজাতি, স্বদেশী ও বিদেশী, স্ত্রী ও পুরুষ এ সকলের কিছুমাত্র বিচার ছিল

না। মানব মাত্রেই তাঁহার প্রেমের পাত্র ছিল। আম অনুসন্ধানে জানিযাছি বিপন্ন মান্দ্রাজী, পরিবারসহ মৃত্যু মুখে তাঁহার সহায়তায় প্রাণ পাইযাছে—ফিরিঙ্গি দরিদ্র পরিবার বহুসন্তান লইয়া তাঁহার সাহায্যে দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিয়াছে—সর্ব্বজন পরিত্যক্ত মুমূর্ষু স্বৈরিণী তাঁহার সেবায় প্রাণ পাইযা কৃতার্থ হইযাছে। গৃহস্থের প্রযোজনে গোবৎস গাভীর দুগ্ধ পানে বাধা পাইতেছে দেখিয়া, যে মহাত্মা দীর্ঘকাল দুগ্ধ পানে বিরত ছিলেন, তাঁহার হৃদয় যে কত কোমল, তাহা আমরা হৃদযঙ্গম করিতে পারি কি না সন্দেহ। তাই বলি তাঁহার লোকহিতৈষণা ও জীবে দযার অন্য তুলনা মিলে না—তিনিই তাঁহার তুলনাস্থল।

পিতৃমাতৃভক্তির পরিচাযক দৃষ্টান্তের উল্লেখ পৌরাণিক অখ্যাযিকায অনেক শুনিতে পাওয়া যায। কিন্তু আধুনিক কালে পিতামাতার শতবিধ অন্যায আচরণ সহ্য করিতে এবং তাঁহাদের প্রীতি সাধনার্থ জীবন বিসর্জ্জন দিতে চিরজীবন প্রস্তুত থাকার দৃষ্টান্ত অতি অল্পই শুনিতে পাওয়া যায। বহুবিদ্যার আধার ও প্রচুর ধনের অধিকারী হইযাও তিনি এক দিকে যেমন চিরজীবন দীন দুঃখীর সেবায সুখানুভব করিতেন অন্যদিকে পিতামাতার সেবা ও সুখ সাধনে নিয়ত সমভাবে যত্নবান ছিলেন এবং দেবতা জ্ঞানে ভক্তিভরে প্রতিদিন তাঁহাদের পূজা করিতেন।

কলস্রোতে প্রবাহিত ভাগীরথী-নীর শৈলবক্ষঃ অতিক্রম করিয়া যেমন দক্ষিণে ও বামে সুখ ও সম্পদ, পুণ্য ও পবিত্রতা বিতরণ করিয়া অনন্তের উদ্দেশে ছুটিয়াছে, শতপ্রকারে প্রতিবেশিপীড়নপ্রিয় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের প্রস্তরবৎ শৈশব-নিষ্ঠুরতার পাষাণ ভেদ করিয়া লোক-সেবার যে মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাও তদ্রূপ সমগ্র দেশের সুখসাধন করিয়া, সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া, কত কোটী কোটী লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া অনন্তের পথে অগ্রসর হইয়াছে!

সম্পূর্ণ।